টেলিভিশনে দীন প্রচার : উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ : শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

গবেষণা প্রবন্ধ

মুফতী জহীরুল ইসলাম

সম্প্রতি মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলগুলোতে চরম ইসলাম বিদ্বেষী ইয়াহুদী লবি ও তাদের বিশ্বস্ত এজেন্টদের দৌরাত্ম উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে। ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধানকে তারা বিকৃত করে তাচ্ছিল্যের সাথে উপস্থাপনে যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করছে মিডিয়াকে। মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসী, জঙ্গী হিসাবে বিশ্বদরবারে পরিচয় করে দেয়ার হীন কৌশল প্রয়োগ করতে তারা সামান্যতম কার্পণ্যও করছে না। সেখানে দৈনন্দিনের মাসআলা-মাসাইল ও ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয় তাতে অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণভাবে বাতিল পূজারীদের ধর্ম বিশ্বাসকে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ এবং হকপন্থীদের মতবিশ্বাসকে ঠুনকো ও অসত্য হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ শিক্ষিত দীনদার শ্রেণী এখন নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে।

আসলে টিভি চ্যানেলগুলোতে হরহামেশা লাগামহীনভাবে যে অশ্লীল ফিল্ম, মিথ্যা ড্রামা ও নির্লজ্জ দৃশ্য প্রচার করা হচ্ছে, তা যতটা না সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও চিন্তা চেতনাকে বরবাদ করছে তার চেয়ে বেশি বরং ঐ তথাকথিত দীনী প্রোগ্রামগুলোই বরবাদ করছে। কারণ কোনো ব্যক্তি অশ্লীল ফিল্মকে নেকী ও সওয়াবের কাজ মনে করে দেখে না; মন্দ ও গুনাহের কাজ মনে করে দেখে। পক্ষান্তরে কথিত দীনী প্রোগ্রামগুলো প্রায় সকলেই দীন ও সওয়াবের কাজ মনে করে দেখে ও শুনে থাকে। কাজেই এ কথা বলা বাহুল্য যে, টিভি চ্যানেলগুলোর নামসর্বস্ব দীনী প্রোগ্রামগুলো নতুন ও তরুণ প্রজন্মের জন্য ঐ সব নগ্ন, অর্ধনগ্ন ব্লু-ফিল্ম থেকেও বেশি ক্ষতিকর।

উদ্বিগ্ন উলামায়ে কেরাম

এমনই এক ক্রান্তিকালে দেশ, জাতি, দীন ও মিল্লাতের প্রতি দরদী প্রাণ একদল উলামায়ে কেরাম মনে করছেন, এ মুহূর্তে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের টিভি চ্যানেলগুলোতে অংশগ্রহণ করে এ ফেতনার মোকাবেলায় ময়দানে নেমে আসা প্রয়োজন। অবস্থার প্রেক্ষিতে টিভি, সিডি ও ক্যাবল চ্যানেলের দীনী প্রোগ্রামসমূহকে জায়েয ফাতওয়া দিয়ে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করা যুগ সচেতন উলামায়ে কেরামের দীনী দায়িত্ব। তারা মনে করেন ক্যাবল চ্যানেলের কর্দমাক্ত জলাশয়ে ডুবে যাওয়া সাধারণ মুসলমানকে ডুব দিয়ে সেখান থেকে উঠিয়ে আনা উচিত। এখনো এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের স্বাতন্ত্র্য ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিজস্ব এমন ইসলামী চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যা দেখে দীনদার সাধারণ মুসলমানগণ তাদের দীন-ঈমান, আকায়েদ, মাযহাব নিরাপদ রাখবে এবং বদদীনীর বিষাক্ত সয়লাবে ভেসে যাওয়া তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। এছাড়া দীন, ঈমান, মাযহাব আকারে ইসলাম ও আমলকে কুরআন সুন্নাহের মাপকাঠিতে রেখে গোটা মুসলিম উম্মাহকে পথ দেখাবে।

উম্মতের কাণ্ডারী উলামায়ে কেরাম কী বলেন?

কিন্তু উম্মতের কাণ্ডারী হকের পতাকাবাহী অপর একদল নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের অবস্থান আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। তাদের বক্তব্য হল, টেলিভিশনকে ইসলাম ও দীন প্রচারের মাধ্যম বানানো বর্তমান পরিস্থিতিতেও জায়েয হবে না। তারা তাদের এ দাবীর স্বপক্ষে যেসকল দলীল প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করে থাকেন নিম্নে সেগুলো নিয়ে আলোকপাত করবো।

টিভি, ভিডিও ও সিডির ছবিও হারাম ছবির অর্ন্তভুক্ত

এক. সাধারণত টেলিভিশন ও মিডিয়া প্রোগ্রাম ছবি ব্যতীত তৈরি হয় না। অথচ প্রাণীর ছবি তোলা, তোলানো, দেখা, দেখানো সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়েয। এ বিষয়ে গোটা উম্মত একমত। চাই ঐ ছবি প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরি হোক, চাই রাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্মিত হোক, চাই অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হোক। কারণ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবির ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

স্থির নয় এমন ছবিও নিষিদ্ধ ছবির অর্ন্তভুক্ত

কেউ কেউ টিভি ভিডিও ফিল্মের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিকে শরীয়তের নিষিদ্ধ ছবির অর্ন্তভুক্ত বলতে রাজি নন। কিন্তু উম্মতের আস্থাভাজন হাক্কানী উলামায়ে কেরামের একটা বিশাল অংশের মতে এটাও নিষিদ্ধ ছবির অর্ন্তভুক্ত।

কারণ আপাত দৃষ্টিতে যদিও ঐ ছবি দৃশ্যমান হচ্ছে না, কিন্তু কোনো এক সময় সেটাকে সিডিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং এখন তা সেটার মধ্যেই সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। যখন ইচ্ছা তখনই সেটা টিভি স্ক্রিনে বা মনিটরে দেখানো যাবে। পার্থক্য এতটুকু যে, ঐ ছবিকে ক্যাসেট/ সিডির মধ্যে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয় যে, খালি চোখে তা দেখা যায় না। কিন্তু বাস্তবতা হল, তা সংরক্ষিত আছে। মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এ কারণেই চাইলে তা দেখানো যায়।

এ ক্ষেত্রে বড়জোর এতটুকু বলা যাবে যে, হাত দিয়ে ছবি নির্মাণের প্রাচীন রীতির পরিবর্তে বিজ্ঞান একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু শরীয়তে যেহেতু ছবিকে হারাম করা হয়েছে, তাই ছবি তোলার যে কোনো নতুন পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন সে পদ্ধতিতে ছবি তুললে নিঃসন্দেহে তা হারামের আওতাভুক্ত হবে।

মুহাক্কিক আলেমগণের মতে হাতে তৈরি ছবির তুলনায় টিভি, ভিডিও ফিল্মের ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ছবির জঘন্যতা ও অনিষ্টতার পরিমাণ বহুগুণে বেশি। টিভি ও ভিডিওর ছবির মাধ্যমে আজ প্রতিটি ঘর সিনেমা হলে পরিণত হয়েছে। ফলে আজ একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, ইসলামী শরীয়ত ছবির বিরুদ্ধে কেন এত কঠোর। ছবির নির্মাতাকে কেন অভিশপ্ত ও কিয়ামতের দিন সবচেয়ে মারাত্মক শাস্তির উপযুক্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি বলা হয়, এ ছবি মুছে যায় এবং পরবর্তীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার তৈরি

হয়ে যায়, এভাবে প্রতি মুহূর্তে তা আসে আর যায়, তাহলে এই অবস্থায় অনিষ্টতা তো আরো অধিক। কেননা এতে বার বার ছবি তৈরির গুনাহ হতে থাকে।

সামাজিক পরিভাষায় ভিডিওর তাসবীরকে ছবি বলা হয়

তাছাড়া সামাজিক পরিভাষা ও মানুষের স্বাভাবিক কথা-বার্তায়ও এটাকে ছবি বলা হয়। আর শরঈ হুকুম অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক পরিভাষা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নয়। যেমন সুবহে সাদিক, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ইত্যাদিকে শরীয়ত কোন সূক্ষ্ম বিদ্যা ও জটিল শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল রাখেনি। বরং প্রকাশ্য ও সরল আলামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সাদ্দে যরী'আহর কারণেও অ-স্থির ছবি হারাম

যদি মেনে নেয়া হয় যে, টিভি সিডি ও ভিডিওর ছবি স্থির নয়; একটি ছায়া মাত্র। আর হারাম তো স্থির ছবি; অ-স্থির ছবি নয়, তাহলে সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্য কখনো বুঝবে না। টিভি ভিডিওর এ ছবিকে ছাড় দেয়া হলে ছবি জায়েয হওয়ার পালে হাওয়া লেগে যাবে। তখন সর্বসম্মতিক্রমে হারাম স্থির ছবিকেও হালাল মনে করার হিড়িক পড়ে যায়। তাই সাদ্দে যরীআহ তথা 'সর্বসম্মত হারামে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমকে বন্ধ করে দেয়া'র জন্য অনুসরণ করলেও আলোচ্য ছবিকে হারাম বলা যুক্তিসঙ্গত হবে।

অ-স্থির চিত্র দেখার বাহানায়...

উপরে বর্ণিত আশঙ্কা বর্তমানে আর আশঙ্কায় অবশিষ্ট থাকেনি, বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। কারণ কতিপয় বুদ্ধিজীবী আলেম যখন উম্মতের সামনে তাদের নতুন এ গবেষণা পেশ করল যে, 'টিভি, সিডি ও ভিডিওর মাঝে যেহেতু ছবিগুলো স্থির থাকে না তাই তাকে হারাম তাসবীর বলা যাবে না।' তাদের এ ফতওয়া পেয়ে এতদিন পর্যন্ত যে সকল সাধারণ দীনদার মুসলমান টিভি ইত্যাদিকে নাজায়েয মনে করে মুখ ফিরিয়ে ছিল তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার (?) করতে কার্পণ্য করেনি। তারা জায়েয ও অশ্লীলতামুক্ত দৃশ্য দেখার বাহানায় ধীরে ধীরে প্রতিটি খারাপ প্রোগ্রাম, নগ্ন- অর্ধনগ্ন ও অশ্লীল দৃশ্য দেখতে শুরু করেছে। এমন অনেক দীনদার মুসলমানের কথা জানা আছে, যারা খবর দেখা কিংবা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর যুলুম অত্যাচার আর মুজাহিদগণের জিহাদের দৃশ্য দেখার বাহানায় টিভি, সিডি আর ভিসিআর ক্রয় করেছেন বা এগুলোর সামনে বসেছেন। এক পর্যায়ে এসে তারা অশ্লীল নাটক ও ছায়াছবি দেখতে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমনকি এক শ্রেণীর আলেমরাও পত্র-পত্রিকায়, পোস্টার-বিজ্ঞাপনে দিব্যি স্থির ফটোর ব্যবহার শুরু করেছেন। এটা ছবির ব্যাপারে সেই শিথিলতারই একটা কুফল।

টিভি, সিডি ও ভিডিওর ছবিও যে হারাম তসবীরের অন্তর্ভুক্ত সে আলোচনা এ পর্যন্তই। এবার মূল আলোচনায় ফেরা যাক।

শুধু দীন প্রচার করাই ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়

দুই. যেহেতু টেলিভিশন তৈরিই করা হয়েছে অবৈধ খেল-তামাশা ও চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে তাই এটাকে দীনী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা শুধু ভুলই নয়, দীনকে অসম্মান ও অপদস্ত করার নামান্তর। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে মদ ও শরাব তৈরির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত পাত্র হানতাম, দুব্বা, নক্বীর ও মুযাফ্‌ফাতকে পরিষ্কার ও পবিত্র করে ব্যবহার করার অনুমতি দেননি। সেগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কারণ এগুলো ছিল মদের স্মারক। (বুখারী শরীফ ১/১৩)

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মদের স্মারক ও প্রতীক বলে বিবেচিত মদিরা পাত্রগুলো ব্যবহার করার এবং সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি না দিয়ে বরং নিষেধ করে দেন তাহলে টেলিভিশন, ডিভিডি ইত্যাদি বিনোদনের মাধ্যমগুলোকে যখন কেবলই অবৈধ খেল-তামাশা ও চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে তখন সেগুলো দ্বারা দীনের নামে উপকৃত হওয়ার অনুমতি কিভাবে দেয়া হবে? এবং এগুলোকে দীন প্রচারের কাজে ব্যবহার করা কিভাবে জায়েয হবে?

তাছাড়া শুধু দীন প্রচার করা ও দীনের তথ্য সরবরাহ করাই ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা। নিজের মানসিকতা পবিত্র করা। চেতনা পরিশুদ্ধ করা। পরকালের চিন্তা উদ্বেলিত করা। তো এসব উদ্দেশ্য টেলিভিশন অথবা মৌলিকভাবে গুনাহের কাজে ববহৃত যন্ত্র দিয়ে অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়।

টেলিভিশনের দীনী প্রোগ্রাম নর্দমা দিয়ে ভেসে আসা মিষ্টান্ন তুল্য

তিন. টেলিভিশনে ওয়াজ-নসীহত, দীন ও ইসলাম প্রচার ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপকারী উলামায়ে কেরামের বিষয়টি এই দৃষ্টকোণ থেকে বিচার করা উচিত যে, যে স্টেজ থেকে নিত্য নগ্নতা, উলঙ্গপনা ও ঈমান বিধ্বংসী ফিল্ম প্রচার করা হয়, যেখান থেকে হরহামেশা চরিত্র বিনাশী কুৎসিত প্রোগ্রাম আর গান-বাজনার সুর ছড়ানো হয়, যেখানে নোংরা সিনেমা ও ড্রামা প্রদর্শন করা হয়, সে একই স্টেজ থেকে, একই প্লাটফর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলার কালামের তাফসীর, রাসূলের পবিত্র ও বরকতময় হাদীসের ব্যাখ্যা ও দীনী বিষয়ে লেকচার শোনানো দেখানো কি করে জায়েয হতে পারে? এতে কি কুরআন-সুন্নাহর অপমান ও অবমাননা করা হয় না? দীন ও ইসলামের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রর্দশন করা হয় না? নিঃসন্দেহে এটা দীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপের শামিল। সর্বক্ষণ যেখানে চরম বেহায়াপনাসহ অসংখ্য হারাম প্রোগ্রাম চলতে থাকে সেখানে কিছু সময়ের জন্য ইসলামী প্রোগ্রাম প্রচার করা, মাঝেমধ্যে একআধটু ধর্মীয় বাণী প্রচার করা– অপবিত্র নোংরা নর্দমা দিয়ে মিষ্টান্ন ভেসে আসা বা নাচ-গানের আসরের ফাঁকে ফাঁকে দীনী উপদেশ শোনানোর নামান্তর বৈ কি! কোনো রুচিশীল মানুষ যেমন ঐ মিষ্টান্ন খেতে পছন্দ করে না এবং চিন্তাশীল-মাত্রই ঐ উপদেশকে উপহাস বলে মনে করে ঠিক তেমনই টেলিভিশনে দীন প্রচারের বিষয়টিকে তুলনা করা যেতে পারে।

অন্যকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর জন্য নিজে গোমরাহ হওয়ার সুযোগ নেই

চার. একটি স্বীকৃত মূলনীতি হল, মন্দ দিয়ে মন্দ দূর করা যায় না। টেলিভিশনে গিয়ে টেলিভিশনের খারাবীগুলো দূর করতে যাওয়া এমনই যেমন পেশাব দিয়ে পায়খানার নাপাকী দূর করতে যাওয়া।

অন্যদেরকে কোনো গোমরাহী ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য নিজে সেই গুনাহ ও গোমরাহীর কাছে যেতে হবে এ যুক্তি কোনো বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের সামান্য পার্থিব জীবনকে সংকটের মুখে ঠেলে দেয় না, তখন শুধু এতটুকুর সম্ভবনার উপর ভিত্তি করে যে, 'হয়তো আমার মাধ্যমে কেউ সত্য পথের পথিক

হয়ে যাবে' কী করে কেউ গুনাহে লিপ্ত হয়ে নিজের আখেরাতে চিরস্থায়ী যিন্দেগী বরবাদ করতে পারে? এমনটি কেউ করতে চাইলে শরীয়ত কি তাকে এর অনুমতি দিবে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি হক্কানী উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন একটি উদাহরণ কি এমন দেখানো যাবে, যেখানে অপরকে হেদায়াত করার খায়েশে কেউ নিজে গোমরাহীর পথ ধরেছেন বা এর সমর্থন করেছেন?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের যুগে মুনাফেক গোষ্ঠিসহ তাবৎ কাফের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়েছে কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি যে, তাদের আসরে বা তাদের আড্ডায় গিয়ে গিয়ে তাদের সমালোচনার জবাব দিতে হবে, তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হবে। বরং তাদের সকল অবৈধ প্রোপাগাণ্ডার বিপরীতে তিনি নিজের কর্মপদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন এবং দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে, প্রয়োজনে তাদের সাথে বির্তকও করতে হবে, তবে এসব করতে হবে ইসলামের নিরাপদ সীমারেখার ভিতরে থেকে। বাধ্যতামূলকভাবেই এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে বলতে হবে ইসলামে প্রচার ও দাওয়াতের নিজস্ব কোনো কারিকুলাম নেই এবং নেই কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ-রেখা। বরং প্রয়োজনে সময়ের চাহিদা মোতাবেক বেশভূষা বদলানোর অনুমতি রয়েছে। ধরুন, কোনো আসরে একমাত্র দাড়িবিহীন লোকই উপস্থিত হতে পারে সেখানো দাড়ি শোভিত কোনো ব্যক্তির প্রবেশাধিকার নেই। তাহলে কি ঐ আসরে দাওয়াতদানকারীকে নিজের কথা কবুল করানোর জন্য দাড়ি শেভ করে তাদের মত হওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে? কখনোই নয়। তাহলে টেলিভিশনের অবৈধ পন্থার প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

উলামায়ে কেরাম টিভি প্রোগ্রামে অংশ নিলে সাধারণ মুসলমান অজুহাত পেয়ে যাবে

পাঁচ. উম্মতের দরদীপ্রাণ যে সকল উলামায়ে কেরাম টিভির প্রোগ্রামে উলামাদের ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন, তারা কি এ বিষয়টা কখনো ভেবে দেখেছেন, দীন ও ইসলামের পথ-প্রদর্শক হক্কানী উলামায়ে কেরাম যদি টেলিভিশনে দীন প্রচার করতে শুরু করেন, তাহলে কি এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, অবৈধ খেলতামাশা ও চিত্তবিনোদনের এই যন্ত্রটির ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তারা সাধারণ মুসলমানকে কিভাবে সর্তক করবেন? তারা নিজেরাই যখন টিভি স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করবেন তখন অন্যদেরকে কিভাবে তা দেখা ও ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করবেন? তখন কি মানুষ তাদের কথা শুনবে? বিষয়টি কি তখন আরো জটিল হয়ে পড়বে না?

যদি ধরে নেই যে, উলামায়ে কেরাম তখনও সাধারণ মুসলমানকে টেলিভিশন থেকে দূরে রাখতে ও তাদেরকে তা থেকে বাঁধা দিতে সক্ষম হবেন, তাহলে তখন কি তাদের এ কথা বলার অধিকার থাকবে না যে, আপনি যেভাবে দীনী প্রোগ্রাম করতে টিভিতে অংশ নেন এবং এটা আপনার জন্য জায়েযও বটে তখন একইভাবে আমরাও যদি শুধু দীনী প্রোগ্রাম দেখার জন্য টিভি কিনে ঘরে রাখি ও তা দেখি তাহলে তা নাজায়েয হবে কেন? বলুন তো তখন এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে? উত্তর যদি এই হয় যে, জায়েয প্রোগ্রাম দেখার জন্য টিভি রাখা ও তা দেখা জায়েয আর এই সুযোগে ঘরে ঘরে টিভি প্রবেশ করে, তাহলে জায়েযের প্রবক্তা ঐ সব উলামা মহোদয়গণ এই গ্যারান্টি দিতে পারবেন কি যে, এই টিভি দিয়ে সর্ব প্রকার নষ্ট-ভ্রষ্ট অশ্লীল ও ঈমান বিধ্বংসী প্রোগ্রামগুলো দেখা হবে না? গোটা দুনিয়ার ব্লু-ফিল্মগুলো দেখা হবে না? পরিবারের কেউ দেখবে না? ঘরে একবার টেলিভিশন ঢুকে যাওয়ার পর কোন অনুষ্ঠান জায়েয আর কোন অনুষ্ঠান নাজায়েয সে ফাতওয়া নেওয়ার জন্য কয়জন অপেক্ষা করবে? কয়জনকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে?

দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে নাজায়েয পন্থা অবলম্বন করা জায়েয নয়

ছয়. কেউ কেউ বলেন, কাফের ও বেদীন শক্তি যদি টিভিকে ইসলামের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে আমরা কেন সেটাকে ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারবো না?

বাহ্যত এসব মুসলিম ভাইদের চিন্তা-চেতনা ইখলাস প্রসূত। তাদের এই আবেগ প্রশংসনীয়ও বটে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ইসলাম ও দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনো নাজায়েয ও হারাম মাধ্যম অবলম্বন করা কি জায়েয? যদি এ উদ্দেশ্যে নাজায়েয মাধ্যম গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তো চোরকে সংশোধন করতে হলে চোরের দলে ভিড়তে হবে, যিনাকারদের সংশোধন করতে যিনাকার হতে হবে, এমনিক কাফেরদের সংশোধন করতে হলে শেষ পর্যন্ত কাফেরদের তালিকায় নাম লেখাতে হবে। তাই নয় কি? কোনো সভ্য বিবেক ও আইন এর অনুমতি দিতে পারে না।

এছাড়াও ইসলাম প্রচারের জন্য যদি কোনো নাজায়েয কাজকে মেনে নেওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে কি নাহি আনিল মুনকার তথা অসৎ কাজ থেকে বাধা দেয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে না? তখন প্রত্যেক অপরাধী নিজ নিজ অপরাধের স্বপক্ষে এই খোঁড়া যুক্তি উত্থাপন করবে যে, এটা আমি ইসলাম প্রচারের স্বার্থে করেছি। তখন চোর-ডাকাত লম্পট, মদ্যপ ও খুনি হাতে নাতে ধরা পড়ে বলবে, আমি চোর-ডাকাত, লম্পট, মদ্যপ ও খুনি নই, আমি তো এদের সংশোধনের জন্য এই সূরত ধরেছি। তখন কি গোটা সমাজ অপরাধ আর গুনাহের লীলাভূমিতে পরিণত হবে না?

প্রকৃত সত্য হল, ইসলাম প্রচারের জন্য আমাদের প্রতি এতটুকু নির্দেশনা রয়েছে যে, আমরা এ উদ্দেশ্যে কেবল আমাদের হাতের কাছে থাকা হালাল, বৈধ ও নিরাপদ উপায়-উপকরণগুলোকেই নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করবো। আমাদেরকে এ ঠিকাদারী দেয়া হয়নি যে, হালাল হারাম নির্বিচারে যেকোনো পন্থায়ই হোক ইসলাম প্রচার করতে করতে অবশেষে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাব। যদি এর প্রয়োজন হতোই তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর অনুমতি প্রদান করতেন। সে সময় কুফুর ও শিরক প্রচারে যে মাধ্যম আর উপকরণগুলো ব্যবহৃত হচ্ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই মাধ্যম আর উপকরণগুলো ব্যবহার করারও অনুমতি দান করা হত। কিন্তু কোথায়? ইতিহাস সাক্ষী এগুলোর অনুমতি দেয়া হয়নি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শয়তান মানবদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলাচল করছে। প্রশ্ন হল, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কি শয়তানের প্রতিরোধে মানব রক্তে এভাবে ছুটে চলার অনুমতি বা ক্ষমতা পেয়েছিলেন? উত্তর হল, না। শয়তান তো মানব মন ও ব্রেইনের স্ক্রিনের উপর কুমন্ত্রণার মাধ্যমে উলঙ্গ ও ব্লু-ফিল্ম দেখিয়ে তাদেরকে গুনাহ ও খারাপ কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করছে। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কর্তৃত্ব না দিয়ে বরং বলা হয়েছে, إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (অর্থাৎ আপনি একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ছাড়া আর কিছুই নন। সূরা ফাতির- ২৩) আরো বলা হয়েছে, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (অর্থাৎ আপনি তো তাদের জন্য দারোগা নন। সূরা গাশিয়া- ২৩)

মোটকথা, যদি এর প্রয়োজন হতোই, তাহলে শয়তানকে কুফর-শিরক প্রচারের জন্য যে ক্ষমতা ও সক্ষমতা দেয়া হয়েছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম ও দীন প্রচারের জন্য এর চেয়ে বেশি শক্তি ও সক্ষমতা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন এর প্রয়োজন অনুভব করেন নি, তখন আমাদেরকে শরীয়তের সীমারেখার বাইরে গিয়ে ইসলাম প্রচারের স্বার্থে অতি দরদী সাজার প্রয়োজন নেই। মানব জাতির হেদায়াত ও রাহনুমায়ীর জন্য তাহলে আমরা কি আল্লাহ তা'আলার চেয়েও অধিকতর দরদী হয়ে গেলাম?

খালেস দীনী প্রোগ্রাম দুষ্ট ইয়াহুদীচক্র ও তাদের দোসররা মেনে নিবে না

সাত. চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্র জানেন, টিভি, সিডি, ভিডিওর উদ্দেশ্য আদৌ সমাজ সংস্কার করা নয়, বরং সমাজকে নষ্ট করা। বলাবাহুল্য, এ যন্ত্রটি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার আসল উদ্দেশ্য হল, পশ্চিমা নোংরা সংস্কৃতি ও বেদীনী কালচার মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া। এ প্রেক্ষাপটে যে সকল প্রোগ্রামে দীন, শরীয়ত ও ইসলামী কৃষ্টিকালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকবে সেগুলোকে দুষ্ট ইয়াহুদিচক্র ও তাদের দেশীয় এজেন্ট ও দোসররা কিভাবে সহ্য করবে? এর কী গ্যারান্টি আছে যে, ইয়াহুদী ও হিন্দুদের বংশধররা উলামায়ে কেরামের চিন্তাধারা ও কথাগুলো হুবহু টেলিভিশনে সম্প্রচার করতে দিবে? বাস্তবতা হল, কোনো আলেম যখন সঠিক তথ্য প্রকাশ করবেন তখন তার কথাগুলো সরকার ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর চিন্তা চেতনা ও মনমানসিকতার পরিপন্থী বিবেচনায় সেগুলো তারা কেটে সেন্সর করে দিবে। কিংবা এদের চ্যানেল বন্ধ করে দিবে। ইসলামের নামে যারা গোমরাহী ছড়াবে তারাই কেবল অনুমতি পাবে।

ইসলামকে নিশ্চিহ্ন কিংবা বিকৃত করা যাবে না

আট. টেলিভিশনে দীন প্রচারের বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে এ যুক্তিও বেশ জোরেশোরে পেশ করা হয় যে, হক্কানী উলামায়ে কেরাম যদি টিভি প্রোগ্রামে এসে জাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে দীনবিরোধী শক্তিগুলো এটিকে দীন বিকৃত করার কাজে ব্যবহার করবে। ফলে দীন ও ইসলাম তার আসল রূপ নিয়ে অক্ষুণ্ন থাকবে না।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, টেলিভিশনের প্রোগ্রাম জায়েয করার জন্য এ যুক্তিটি যতটা না জোরালো তার চেয়ে বেশি আবেগ প্রসূত। কারণ, এটা অলঙ্ঘনীয় যে, অতীতেও ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সমূহ-চেষ্টা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত পর্যন্ত এ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু ইসলামকে নিশ্চিহ্ন কিংবা বিকৃত করে তার আসল রূপ নিঃশেষ করা সম্ভব হবে না। এটাই হাদীসের ভাষ্য। আজ পর্যন্ত ইসলামের সাড়ে চৌদ্দশত বছর কেটে গেছে ইসলাম এখনও পূর্বের মতই সতেজ ও সবুজ আছে। শয়তানের অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও দূরনিয়ন্ত্রিত সম্মোহনী শক্তি সত্ত্বেও ইসলাম আজও সংরক্ষিত। আল্লাহ চাহেন তো আগামীতেও এভাবেই অক্ষুণ্ন থাকবে। তবে আমরা নিজেদেরকে ইসলামের সহীহ খেদমতে পেশ করে কতোটা সৌভাগ্যবান হতে পেরেছি সেটাই মূল বিষয়।

টিভি দেখে কেউ নামাযী কিংবা তওবা করে সাচ্চা মুসলমান হয়নি

নয়. টিভি ও ভিডিও ফিল্ম দিয়ে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব এমন বক্তব্য যে নিছক মূর্খের বুলি এর জ্বলন্ত প্রমাণ হল, আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি যে, কোনো অমুসলিম টিভির বরকতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ, যারা টিভি দেখে তারা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে দেখে। নিজের ইসলাহ কিংবা সংশোধানের নিয়তে তারা এসব প্রোগ্রাম দেখে না।

প্রখ্যাত আলেম মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ. টেলিভিশনে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে যারা অতিউৎসাহী তাদের নিকট বিনয়ের সাথে প্রশ্ন রেখেছেন, এই দীনী প্রোগ্রামগুলো দেখে আজ পর্যন্ত কয় জন অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন? কয়জন বেনামাযী নামাযী হয়েছেন? কয়জন গুনাহগার তওবা করে সাচ্চা মুসলমান হয়েছেন? এগুলো স্রেফ ধোঁকা। অশ্লীলতার এই যন্ত্রটি আদ্যোপান্ত সত্তাগত নাপাক ও অভিশপ্ত। এটির নির্মাতা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। এ ধরনের ইসলাম প্রচার আমাদের কোনই কাজে আসছে না। বরং টিভির এই দীনী প্রোগ্রমাগুলো বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম। অপরিপক্ক ইসলামধারী লোকেরাই এসব প্রোগ্রামে অংশ নেয়। সত্য-মিথ্যা, কাঁচা-পাকা যা কিছু মুখে আসে তাই তারা উগরে দেয়। তাদের মুখে লাগাম পরানোর মত সেখানে কেউ নেই। তাদের বক্তব্যের কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা নির্ণয় করারও কেউ নেই। এখন বলুনতো, এতে কি ইসলাম প্রচার হচ্ছে, নাকি ইসলামের সৌন্দর্যে কালিমা লেপন করা হচ্ছে? (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৭/৩১৮)

উলামায়ে কেরাম পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বেন, শয়তানী চক্রের বিজয় হবে

দশ. টিভি প্রোগ্রামে উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি যারা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেছেন, তাদের ভেবে দেখা উচিত, এর পেছনে শয়তানের কোনো কূটচাল রয়েছে কিনা? কারণ তাদের এ পরামর্শ বাস্তবায়নের জন্য যে সব উলামায়ে কেরাম টেলিভিশনে আসতে শুরু করবেন তারা নিদেনপক্ষে আর সর্বজন শ্রদ্ধেয় থাকবেন না। বিশেষ করে যারা টিভি প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণকে বৈধ মনে করবেন না, তাদের নিকট এমন আলেমদের কোনো কথা, কাজ ও ফাতাওয়া ধর্তব্য হবে না। তারা বির্তকিত হয়ে যাবেন। আর দেশ ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী এসব আলেম পথ প্রদর্শকগণের বিতর্কিত হয়ে যাওয়াটা শয়তান ও তার দোসরদের জন্য মহা বিজয় নয় কি? কারণ, বাতিল পূজারীরা কখনো এটা কামনা করে না যে, মুসলমানরা কাফের মুশরিক হয়ে যাক। তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা হলো, মুসলমান যেন প্রকৃত মুসলমান না থাকে। অন্ততপক্ষে তারা যেন বিশ্ববাসীর নিকট আস্থার প্রতীক হয়ে না থাকে।

এছাড়া টিভিতে ইসলাম প্রচারকে জায়েয স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারী উলামায়ে কেরাম পরস্পর দুটি বিবদমান প্রতিপক্ষে পরিণত হবেন।

(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

রোযা তারাবীহ ই'তিকাফ যাকাত ও সদকাতুল ফিতরের জরুরী মাসাইল

মুফতী ইবরাহীম হাসান

রোযার মাসাইল

রমাযানুল মুবারকের রোযা রাখা 'ফরযে আইন'। এটা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব রমাযানের রোযা অস্বীকারকারী কাফির ও ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত। আর অস্বীকার করা ব্যতীত রোযা তরককারী ফাসিক ও কবীরা গুনাহের অপরাধী।

দশ বছর বয়স্ক নাবালেগকে রোযা রাখার আদেশ করা অভিভাবকের কর্তব্য।

অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থাবস্থায় এবং মুসাফির ব্যক্তির সফররত অবস্থায় রোযা রাখা জরুরী নয়। তবে সফর যদি আরামদায়ক হয় এবং কোন ধরনের কষ্ট ক্লেশ না হয় তাহলে সফর অবস্থায় রোযা রাখা চাই যেন পরবর্তী সময়ে কাযা করার কষ্ট পোহাতে না হয়।

মহিলাদের হায়েয (মাসিক) ও নিফাস (সন্তান প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) এর দিনগুলোতে রোযা রাখা বৈধ নয়। তবে রমাযানের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্র হয়ে গেলে অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা রাখতে হবে। অতঃপর ঈদুল ফিতরের পর ছুটে যাওয়া রোযাগুলো কাযা করে নিবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত রোযার পরিবর্তে ফিদয়া আদায় করার অনুমতি নেই।

যে ব্যক্তি চিররুগ্ন হওয়ার দরুণ রোযা রাখতে সক্ষম নয় এবং ভবিষ্যতেও আশা নেই যে, রোযা রাখার মত সুস্থ হবে সে ব্যক্তি প্রতি রোযার পরিবর্তে ১৬৩৬ গ্রাম গম অথবা তার মূল্য দ্বারা ফিদিয়া আদায় করতে পারবে। ফিদয়া আদায় করার পর পুনরায় যদি রোযা রাখার মত সুস্থতা লাভ করে তাহলে কাযা করা জরুরী।

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় রোযা রাখার জন্যও নিয়ত করা জরুরী। অতএব মনে মনে রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করলে তাকেই রোযার নিয়ত বলা হবে। মুখে কোন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা জরুরী নয়। তবে মুখে উচ্চারণ করে নিলে উত্তম হবে। নিজ ভাষায় এভাবে বলা যায় 'আমি আগামী দিনের রোযা রাখার নিয়ত করছি'।

রমাযানের রোযার নিয়ত করার সময় হল, রাত্রি থেকে আরম্ভ করে দ্বিপ্রহরের প্রায় এক ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত। তবে সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করে নেয়া উত্তম।

রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সাহরী খাওয়া সুন্নাত। এই সাহরী খাওয়াকেই রোযার নিয়ত বলে ধরে নেয়া হবে, যদিও মুখে কিছু না বলে।

রাত্রি বেলায় রোযার নিয়ত করে নেয়ার পর সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার, সহবাস ইত্যাদি জায়েয আছে। এগুলোর কারণে রোযার নিয়তের মধ্যে কোন বিঘ্ন বা পার্থক্য আসবে না।

রোযার কতিপয় সুন্নাত ও আদব

রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সাহরী খাওয়া সুন্নাত। সাহরীতে খেজুর খাওয়া স্বতন্ত্র সুন্নাত। সাহরীর সুন্নাত আদায়ের জন্য খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করা জরুরী নয়, বরং সহজলভ্য যে কোন কিছু পানাহার করলে এ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

সাহরী শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে খাওয়া উত্তম। তবে এত বিলম্ব না করা যে, সুবহে সাদিক হওয়ার সন্দেহে পড়তে হয়। এতটা বিলম্ব করা মাকরূহ।

যদি কেউ রাত বাকি আছে মনে করে সাহরী খায়। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল, সাহরী সুবহে সাদিকের পরও খাওয়া হয়েছে, তাহলে তার রোযা হবে না। পরবর্তীতে শুধু কাযা করে নিতে হবে।

সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে ইফতার করা সুন্নাত। এটা কল্যাণ ও বরকতের কারণ।

ইফতার করার সময় এই দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব,

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفرلي ما قدمت وما اخرت

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করছি। অতএব তুমি আমার অগ্র-পশ্চাতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। উপরোক্ত দু'আ ছাড়াও বিভিন্ন শব্দ দ্বারা ইফতারীর দু'আ বর্ণিত আছে। হাদীসে বর্ণিত যে কোন দু'আ পাঠ করে নিলেই মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে।

ইফতার করার সময় এত তাড়াহুড়া করবে না যে, সূর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার করা হয়ে যায়। যদি কেউ সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার ধারণায় ইফতার করে নেয় এবং পরবর্তীতে জানা যায় যে, ইফতার সূর্যাস্তের পূর্বে করা হয়েছে, তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এই রোযার কাযা করে নেয়া জরুরী।

খেজুর, খুরমা দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত। এগুলো ব্যতীত দুধ জাতীয় দ্রব্য দ্বারা ইফতার করাও উত্তম।

ইফতারের সময় দু'আ কবুল হয়ে থাকে। ইফতার করার পূর্বে অথবা ইফতার থেকে সম্পূর্ণ ফারেগ হয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।

পবিত্র রমাযান মাসে মুয়াযযিনগণ ইফতার করার পর মাগরিবের আযান দিবে। আযান দেয়ার পর কিছুক্ষণ বিলম্ব করে জামা'আত কায়েম করার অবকাশ আছে।

রোযাদারকে ইফতার করালে রোযাদার ব্যক্তির রোযার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। আর তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর সওয়াব আরও বেশি। এর বিনিময়ে হাউযে কাউসারের পানি পান করানো ও জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা রয়েছে।

রোযাদারের জন্য নাজায়েয ও মাকরূহ কাজসমূহ

রোযাদারের জন্য মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গীবত (অন্যের অগোচরে তার দোষ চর্চা) করা, কুটনামি করা, মিথ্যা কসম খাওয়া, অশ্লীল কাজ করা, অশ্লীল কথা-বার্তা বলা, যুলুম-অত্যাচার ও অবিচার করা, কারো সাথে দুশমনী করা, পরস্ত্রী অর্থাৎ যে সকল মেয়েলোকদের দেখা দেয়ার অনুমতি শরীয়ত দেয়নি (যেমন ভাবী, শ্যালিকা, মামী, চাচী, সহোদর বোন ও দুধবোন ব্যতিত অন্য সকল প্রকার বোন, ধর্ম-মা, ধর্ম-বোন, পালক মেয়ে/বোন ইত্যাদি, মেয়েদের জন্য দুলাভাই, ভগ্নিপতি, দেবর, ভাসুর, সহোদর ভাই ও দুধভাই ব্যতিত সকল প্রকার ভাই, নিজ শ্বশুর ব্যতীত সকল প্রকার শ্বশুর ইত্যাদি) এদের সাথে দেখা দেয়া, মেলা-মেশা ও উঠা-বসা করা, টিভির পর্দায় হোক অথবা সিনেমার পর্দায় হোক ছবি দেখা– এসব কাজ নাজায়েয, অতএব এগুলোসহ অন্যান্য সকল খারাপ ও নাজায়েয কাজ থেকে রোযাদারের বেঁচে থাকা জরুরী। এই সকল কাজ দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে না, তবে মারাত্মক ক্ষতি হবে, মাকরূহ হবে এবং সওয়াব হ্রাস পাবে।

রোযা অবস্থায় বিনা ওযরে কোন জিনিসের স্বাদ নেয়া, চিবানো মাকরূহ।

রোযা অবস্থায় কামভাব নিয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা মাকরূহ।
ক্লান্তিকর সফরে রোযা রাখার কারণে অত্যাধিক কষ্ট হলে রোযা রাখা মাকরূহ।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

যদি কাউকে মেরে ফেলা বা অসহনীয় ক্ষতি সাধন করার হুমকি দিয়ে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা করা জরুরী হবে, কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।
গোসল বা উযূ করার সময় পানি গলার ভিতরে প্রবেশ করে এবং রোযার কথা স্মরণ থাকে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা জরুরী হবে।
যেসব বস্তু খাদ্য, ঔষধ অথবা অন্য কোন শারীরিক উপকারার্থে ব্যবহার হয় না তা খাওয়া বা পান করার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে।
দাঁতের ফাঁকে যদি ছোলা বুট পরিমাণ বা তার চাইতে বড় কোন খাদ্যদ্রব্য আটকে থাকে এবং তাকে জিহ্বার সাহায্যে বের করে গিলে ফেলা হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছোলা বুট থেকেও ছোট পরিমাণ হয় তাহলে রোযা ভাঙবে না। তবে মাকরূহ হবে।

আর খিলাল বা আঙ্গুলের সাহায্যে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললে সর্ববাস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে।
দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে মিশে যদি গলার ভিতরে চলে যায় তাহলে রক্তের ভাগ থুথুর চেয়ে বেশি হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা করতে হবে। থুথুর পরিমাণ কম হলে রোযা ভাঙবে না।
যদি পায়ুপথে ঔষধ ব্যবহার করা হয়, আর সেই ঔষধ ভিতরে প্রবেশ করে অথবা নাক, কানের ভিতরে ঔষধ ঢালা হয় তাহলে এই সব অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা জরুরী হবে।
নিজ স্ত্রী, অন্য মেয়েলোক অথবা কোন পুরুষকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ বা চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এতে কাযা জরুরী হবে।
যদি রোযা রাখার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেউ কিছু খায় বা পান করে অথবা সহবাস করে, অতঃপর এই ধারণা করে যে, আমার এ কাজ দ্বারা তো রোযা ভেঙ্গেই গেছে– এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে আবার উক্ত কাজগুলোর কোন একটি বা সব কয়টি করে, তাহলে রোযা ভাঙ্গার কারণে কাযা ওয়াজিব হবে। তবে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।
রমাযান মাসে দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গে না।
আপন স্ত্রী বা অন্য মেয়েলোকের দিকে কামভাব নিয়ে দৃষ্টিপাত করার দ্বারাই যদি বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে রোযা ভাঙবে না।
কানের ভিতরে পানি চলে যাওয়া অথবা পানি প্রবেশ করানোর দ্বারা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী রোযা ভাঙবে না।
যদি কোন ব্যক্তি নিজ দেশে চাঁদ দেখে রোযা রাখা আরম্ভ করার পর রমাযান মাসের ভিতরেই এমন কোন দেশে চলে যায়, যে দেশে যাওয়ার কারণে তার রোযা দুই/একটি কমে যায়। তাহলে ঈদুল ফিতরের পর নিজ দেশের হিসাব মোতাবেক অবশিষ্ট রোযাগুলো কাযা করবে।
যদি নিজ দেশে চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ করে এমন দেশে চলে যায়, যেখানে যাওয়ার কারণে তার রোযা ত্রিশটি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ দেশে তখন রোযা আটাশ বা উনত্রিশটি হয়। তাহলে ত্রিশ পরবর্তী রোযা গুলো রাখা না রাখা উভয়টির এখতিয়ার রয়েছে। তবে সকলের সাথে একাত্মতা বজায় রাখার লক্ষ্যে রোযা রাখাই উত্তম। এ রোযা নফল হিসাবে গণ্য হবে।
যদি কোন ব্যক্তি নিজে চাঁদ দেখে এবং একা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু সাক্ষ্য প্রদানের নেসাব পূর্ণ না হওয়ায় তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয়ে যায়, তাহলেও চাঁদ দর্শনকারীর জন্য রোযা রাখা জরুরী। যদি সে রোযা না রাখে বা রাখার পর ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে ঐ দিনের রোযার কাযা করতে হবে।
রোযার দিনে রোযা রাখার পর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বা সহবাস করার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়, এতে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়ে যায়।
তেল অথবা সুরমা ব্যবহার করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু কেউ যদি তেল অথবা সুরমা ব্যবহার করার পর ধারণা করে যে, এর কারণে রোযা ভেঙ্গে গেছে। তারপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বা সহবাস করে, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি আবশ্যকীয় হবে।
যদি কেউ মেসওয়াক করার পর বা থুথু গিলে ফেলার পর মনে করে যে, রোযা ভেঙ্গে গেছে। এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে তাহলে কাযা ও কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।
যদি একই রমাযান মাসে পানাহার দ্বারা একাধিক বার রোযা ভঙ্গ করে, তাহলে যে কয়টি রোযা ভঙ্গ করেছে সে কয়টিই কাযা করতে হবে। তবে কাফফারার ক্ষেত্রে একটিই যথেষ্ট হবে।
শরীরের গোশতে অথবা শিরায় ইন্জেকশন ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না, চাই ইন্জেকশন রোগের কারণে ব্যবহার করা হোক বা শক্তি অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হোক। তবে বিনা প্রয়োজনে শুধু রোযার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য শক্তিবর্ধক ইন্জেকশন ব্যবহার করলে রোযা মাকরূহ হবে।

বিবিধ মাসাইল

অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিম যদি রোগীকে দিনের বেলা ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেয়, আর রোগীর অবস্থা এমন হয় যে, পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ সেবন না করলে মৃত্যুর বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে ঐ রোগী সুস্থতা অর্জন পর্যন্ত রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় সুস্থ হওয়ার পর কাযা করে নিবে। আর যদি সুস্থতা লাভের আশা শেষ হয়ে যায়, তাহলে মৃত্যুর পূর্বেই ওসিয়ত করে যাবে, যেন ফিদয়া আদায় করে দেয়া হয়।
বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা, পান, নেশাদ্রব্য, গুল তথা প্রত্যেক এমন জিনিস যা কোন উদ্দেশ্যে মুখের ভিতরে রাখা হয়– এগুলোর কিছু অংশ বা নির্যাস যদি গলায় প্রবেশ করে, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি গলায় প্রবেশ না করার ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং গলায় প্রবেশ না-ও করে তবুও রোযা মাকরূহ হবে।
কোন ব্যক্তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ যদি ডাক্তার ও সকল চিকিৎসকদের চিকিৎসা নিষ্ফল প্রতীয়মান হয়, এবং রোযা রাখার দ্বারা রোগ বৃদ্ধি পায়, তাহলে সুস্থতা লাভের আশায় রোযা মুলতবী রাখবে। এরপর যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে কাযা করবে। আর যদি সুস্থতা লাভের আশা না থাকে তাহলে ফিদিয়া আদায় করতে পারে।
যে কোন রোগের টিকা নেয়ার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।
ধূপ, আগর বাতি, আতর ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ নেয়ার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।
ক্ষতস্থান থেকে অধিক পরিমাণে পুঁজ বা রক্ত বের হওয়া বা বের করার দ্বারাও রোযা ভঙ্গ হবে না।
অজ্ঞান, অচেতন ও অসুস্থ হওয়ার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে এমতাবস্থায় চিকিৎসা বা ঔষধ সেবনের উদ্দেশ্যে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয হবে।

দাঁতের মাজন, টুথ পাউডার বা পেস্ট ইত্যাদি রোযা অবস্থায় ব্যবহার করা হলে রোযা মাকরূহ হবে। আর গলার ভিতরে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে রোযার দিনেও মেসওয়াক ব্যবহার করা উত্তম ও সুন্নাত। চাই মেসওয়াক তাজা ডালের হোক বা শুকনো হোক।

যদি অর্শ রোগীর পায়খানা করার সময় গেজ (ভিতরের গোশতের টুকরা) বাইরে চলে আসে এবং শৌচকার্যের পর তা ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার পূর্বে তা শুকিয়ে নিবে, নতুবা এর সাথে পানি ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যজনিত সাধারণ দুর্বলতার কারণে অথবা রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় এবং ভবিষ্যতে সক্ষম হওয়ার আশাও না থাকে তাহলে প্রতি রোযার বদলে ১৬৩৬ গ্রাম গম বা তার মূল্য ফকির বা মিসকিনকে দিয়ে দিবে। অথবা প্রতি রোযার বদলে একজন মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাইয়ে দিবে। এটাকে রোযার ফিদয়া বলে।

তারাবীহ নামাযের মাসাইল

বিশ রাক'আত 'তারাবীহ' এর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এ বিষয়টির উপর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ইজমা' রয়েছে। অতএব এ নামায পড়া বাঞ্ছনীয়। ত্যাগকারী তিরস্কারের উপযুক্ত।

ইশার নামাযের পূর্বে তারাবীহ পড়া হলে তা আদায় হবে না।

রমাযানের চাঁদ দেখার সংবাদ বিলম্বে পাওয়ার দরুন ইশা ও বিতর উভয় নামায আদায় করা হয়ে গেলেও ঐ রাতের তারাবীহ নামায আদায় করতে হবে।

তারাবীহ নামাযের প্রত্যেক চার রাক'আতের পর কিছুক্ষণ বসে তাসবীহ, তাহলীল ও দুরূদ ইত্যাদি পড়া ও যে কোন যিকির করা যায়। একেবারে চুপ থাকাও জায়েয আছে, তবে নির্দিষ্ট কোন দু'আ বা যিকিরকে আবশ্যকীয় মনে করা ঠিক নয়।

তারাবীহ নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কেফায়াহ।

মুস্তাহাব হল, তারাবীহ এর পূর্ণ বিশ রাক'আত একই ক্বারী সাহেবের পিছনে আদায় করা। দুই বা ততোধিক ক্বারী সাহেবের ইকতিদায় আদায় করা হলে উত্তম হল, প্রত্যেক ক্বারী সাহেব কোন এক 'তারবীহা'র পর নিজ নামায শেষ করবে। যদি কোন ক্বারী সাহেব 'তারবীহা'র মাঝখানে নিজ নামায শেষ করেন এবং পরবর্তী ক্বারী সাহেব 'তারবীহা'র মাঝখান থেকে নামায পড়ানো আরম্ভ করেন তাহলে তা খেলাফে সুন্নাত হবে।

বি.দ্র. তারাবীহ নামাযের প্রতি চার রাক'আতকে তারবীহা বলে। তারবীহা অর্থ বিশ্রাম নেয়া। এর বহুবচন হলো তারাবীহ। যেহেতু এ নামাযে প্রতি চার রাক'আত অন্তর বিশ্রামের জন্য বিরতি দেয়া হয় তাই এ নামাযকে তারাবীহ বলা হয়।

যে হাফেযে কুরআনের বয়স চান্দ্র বৎসর হিসাবে এখনও পনের বৎসর হয়নি এবং তার মধ্যে বালেগ হওয়ার কোন আলামত (চিহ্ন) পাওয়া যায়নি এমন নাবালেগের তারাবীহ নামাযসহ কোন নামাযের ইমামতি করা জায়েয নেই।

দেখা যায় কিছু সংখ্যক মুক্তাদী তারাবীহ নামায আরম্ভ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নামাযে শামিল না হয়ে পেছনে বসে থাকে। যখন ইমাম সাহেব রুকুতে যান তখন তাড়াহুড়া করে নামাযে শামিল হয়। বিনা ওযরে এমনটা করা মাকরূহ। এটা নামাযের প্রতি অলসতা ও অবহেলার বহিঃপ্রকাশ এবং মুনাফিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

পবিত্র রমাযান মাসে এক মসজিদে একই সময়ে তারাবীহ নামাযের একাধিক জামা'আত জায়েয আছে (ফিতনা না হওয়ার শর্তে)। তবে এক মসজিদে একটি জামা'আত কায়েম করাই উত্তম।

পারিশ্রমিক (যেটাকে আমাদের সমাজে হাদিয়া বলা হয়) নিয়ে কুরআন খতম পড়া নাজায়েয ও হারাম। এতে সওয়াব হবে না। চাই পারিশ্রমিকের অংক নির্ধারিত হোক বা অনির্ধারিত হোক। এমনিভাবে শর্তকৃত হোক বা প্রচলিত হোক।

পারিশ্রমিক প্রদান ব্যতীত হাফেয সাহেব না পাওয়া গেলে সূরা তারাবীহ (পারিশ্রমিক প্রদান ব্যতীত) পড়া উত্তম। কেননা এতে প্রথমত হারাম থেকে বাঁচা যাবে। দ্বিতীয়ত তুলনামূলক কম হলেও সওয়াব পাওয়া যাবে।

অনেক মহিলা তারাবীহ নামায গুরুত্ব সহকারে আদায় করেন না। অথচ তারাবীহ নামায পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

তারাবীহ নামাযের প্রতি চার রাক'আত অন্তর সম্মিলিতভাবে দুই হাত তুলে দু'আ করা শরীয়তের কোন দলীল বা ফিকহ-শাস্ত্রের কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নেই, বিধায় তা বিদ'আত। তবে কোন ব্যক্তি একা একা দু'আ করে নিলে অসুবিধা নেই।

নাবালেগ হাফেয তারাবীহ নামাযে বালেগ ইমামের লোকমা দিতে পারবে।

যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডায় অথবা এক মুষ্টির চাইতে ছোট করে রাখে, তাকে কোন নামাযেরই ইমাম বানানো জায়েয নেই। এমন ব্যক্তির ইকতিদা করলে নামায মাকরূহে তাহরীমির সাথে আদায় হবে।

ই'তিকাফ

'ই'তিকাফ' আরবী শব্দ। অভিধানিক অর্থ, অবস্থান করা। পরিভাষায় ই'তিকাফ বলা হয়, কোন মুসলমান ব্যক্তির নেকী লাভ ও আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে। চাই তা এক মুহূর্তই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার দরবারে এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

ই'তিকাফ তিন প্রকার, (১) ওয়াজিব (২) সুন্নাত (৩) মুস্তাহাব বা নফল।

সুন্নাত ই'তিকাফ

রমাযানুল মুবারকের শেষ দশকে শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত যে ই'তিকাফ করা হয় তাকে মাসনূন বা সুন্নাত ই'তিকাফ বলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর প্রতি বৎসর রমাযানুল মুবারকে ই'তিকাফ করেছেন। শুধুমাত্র এক বছর ওযরের কারণে ই'তিকাফ করতে পারেননি। তাছাড়া তিনি অন্যান্যদেরকে শেষ দশকের ই'তিকাফ করার উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ ই'তিকাফ করেছেন, আবার কেউ কেউ করেননি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ না করার কারণে কাউকে ভৎর্সনা করেননি। তাই ফুকাহায়ে কেরাম রমাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফকে সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া বলেছেন। অর্থাৎ গ্রাম বা মহল্লার প্রতিটি মসজিদে কোন একজন মুসলমান ব্যক্তি রমাযান মাসের শেষ দশকের ই'তিকাফ করে নেয় তাহলে মসজিদ সংশ্লিষ্ট মহল্লাবাসীর সকলের পক্ষ থেকে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কোন একজনও না করে তাহলে মহল্লা ও গ্রামের সকল অধিবাসী তিরস্কারের উপযুক্ত ও গুনাহগার হবে।

মাসনূন ই'তিকাফ আদায় কারীকে ২০শে রমাযান সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে

মসজিদে প্রবেশ করে শাওয়াল মাসের (ঈদুল ফিতরের) চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে থাকতে হবে।

মাসনূন ই'তিকাফকারীর জন্য ২০ রমাযান সূর্যাস্তের পূর্বে পূর্বে প্রয়োজনীয় সামানাপত্র নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে করে মসজিদে অবস্থানকালে ঐ দিনের সূর্য অস্তমিত হয়।

মাসনূন ই'তিকাফের জন্য পূর্ণ শেষ দশ দিনের ই'তিকাফের নিয়ত করা জরুরী।

কেউ যদি নিয়ত করে যে, প্রথমে পাঁচ দিনের ই'তিকাফ করি, তারপর হিম্মত হলে দশ দিন ই'তিকাফ করব। এভাবে নিয়ত করার দ্বারা মাসনূন ই'তিকাফ পালন হবে না; বরং নফল ই'তিকাফ হবে এবং নফলেরই সওয়াব হবে।

মাসনূন ই'তিকাফের ক্ষেত্রে পূর্ণ দশ দিনের নিয়ত করে ই'তিকাফ আরম্ভ করার পর যদি ২৯শে রমাযান (সন্ধ্যায়) চাঁদ দেখা দেয় তাহলে মাসনূন ই'তিকাফ পূর্ণ হয়ে যাবে। পূর্ণ দশ দিনের নিয়ত করার দ্বারা দশম দিনের ই'তিকাফ কাযা করতে হবে না।

মাসনূন ই'তিকাফ শুরু করার পর যদি ওযর ব্যতিতই মধ্যখানে ই'তিকাফ ফাসিদ করে দেয় তাহলে শুধুমাত্র ঐ দিনের ই'তিকাফ কাযা করে নেয়াই যথেষ্ট।

অপারগতায় বা বিনা অপারগতায় মহল্লার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে কেউই মাসনূন ই'তিকাফ করা জন্য প্রস্তুত না হলে অন্য মহল্লা থেকে কেউ এসে বসলেও মাসনূন ই'তিকাফ আদায় হয়ে যাবে। কেননা মাসনূন ই'তিকাফের জন্য মহল্লাবাসী হওয়া শর্ত নয় তবে উত্তম।

পারিশ্রমিক নিয়ে ই'তিকাফে বসা বা বসানো নাজায়েয এবং গুনাহের কাজ। কেননা ই'তিকাফ একটি ইবাদত যার বিনিময় দেয়া বা নেয়া উভয়টাই হারাম।

মহিলাগণ ই'তিকাফের জন্য ঘরে পর্দাঘেরা স্থান বা এমন কক্ষ বাছাই করে নিবে যেখানে কোন পর পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে। বিশেষ কক্ষের ব্যবস্থা না হলে পর্দা দ্বারা ঘেরাও দিয়ে কক্ষের মত বানিয়ে নিবে।

নাবালেগ ছেলে মেয়েরাও যদি বুঝমান এবং মাসাইল সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয় তাহলে তারাও মাসনূন ই'তিকাফ করতে পারে।

যে মসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অনুষ্ঠিত হয় কেবল সেখানেই ই'তিকাফ জায়েয হবে। চাই জামে মসজিদ হোক বা মহল্লার পাঞ্জেগানা মসজিদ (যেখানে জুম'আ হয় না) হোক।

ই'তিকাফ ভঙ্গকারী কাজসমূহ

শুধুমাত্র মুবাহ গোসল (ফরয গোসল নয়) এর উদ্দেশ্যে অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।

গরম থেকে বাঁচার কিংবা শীতলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে গোসলের জন্য বের হওয়া। অর্থাৎ শুধুমাত্র এ গোসলের জন্য বের হলে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।

মাসনূন ই'তিকাফে বসার সময় যদি মৌখিকভাবে শীতলতা অর্জনের গোসলের জন্য, রোগীর খোঁজ-খবর ও সেবা শুশ্রূষার জন্য, এবং মায়্যিতের জানাযার জন্য বের হবে, এইরূপ শর্তারোপ করে তাহলে এসব কাজের জন্য বের হওয়ার অবকাশ থাকবে।

শুধুমাত্র কুলি করা বা হাত ধোয়ার উদ্দেশ্যে বের হওয়া যাবে না। এর দ্বারা ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা উল্লিখিত কাজগুলো মসজিদে বসেই করা যায়।

নামায আদায় করার জন্য (চাই ফরয হোক বা নফল) কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতের জন্য উযূ করার উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েয।

যে সকল কাজের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয সে সকল কাজ শেষ হওয়ার পর যদি বিনা প্রয়োজনে বিলম্ব করে তাহলে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।

অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য যদি মসজিদ থেকে বের হয়, চাই স্বল্প সময়ের জন্য হোক বা দীর্ঘ সময়ের জন্য হোক, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ভুলবশত হোক ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।

ই'তিকাফকারী ব্যক্তির কোন কারণে যদি রোযা ফাসিদ হয়ে যায় অথবা কোন কারণে রোযা রাখতে না পারে তাহলে এতেও ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। চাই রোযা ভেঙ্গে ফেলা বা না রাখা কোন ওযরবশত হোক বা বিনা ওযরে হোক কেননা মাসনূন ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত।

নফল ই'তিকাফ

রমাযানুল মুবারকের যে কোন সময়, চাই স্বল্প সময়ের জন্য হোক বা বেশি সময়ের জন্য হোক অথবা পূর্ণ শেষ দশকের চাইতে কিছু কম সময়ের জন্য হোক ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব।

রমাযানুল মুবারকের প্রথম ২০ দিনের ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। সুন্নাত নয়। এমনিভাবে ২১ তারিখ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর ই'তিকাফ শুরু করার দ্বারা তা নফল হিসেবে আদায় হবে।

নফল ই'তিকাফ কখনো ফাসিদ হয় না।

যাকাতের মাসাইল

যদি কারো নিকট ৭.৫ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রূপা অথবা সমপরিমাণ মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য বা তরল (নগদ) অর্থ থাকে তাহলে তার উপর বৎসরান্তে শতকরা ২.৫ টাকা হারে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে যদি কারো নিকট কিছু পরিমাণ স্বর্ণ এবং কিছু পরিমাণ রূপা বা কিছু পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য ও কিছু পরিমাণ তরল অর্থ থাকে এবং এগুলো মিলে ৫২.৫ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রূপার সমপরিমাণ মূল্যের হয়ে যায় তাহলেও বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।– ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪৩।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুক্ত-স্বাধীন হওয়া। ২. মুসলিম হওয়া। ৩. সাবালক হওয়া। ৪. বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ সম্পন্ন হওয়া। ৫. যাকাত উপযোগী সম্পদ থাকা। ৬. সম্পদ যাকাত ওয়াজিব পরিমাণ হওয়া বা সমপরিমাণ মূল্য হওয়া। ৭. সম্পদের পূর্ণ মালিকানা থাকা। ৮. বৎসর পূর্ণ হওয়া।– হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭১৩,৭১৪।

যাকাত প্রদানের খাত

১. নিম্নবিত্তের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, যাদের নিকট যাকাত বা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার মত অর্থ সম্পদ নেই। ২. সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত বা জীবিকা উপার্জনে অক্ষম প্রকৃতির মানুষ। ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত ফাণ্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। ৪. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ। ৫. দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে রত মুজাহিদ। ৬. সফরে রিক্তহস্ত হয়ে পড়া মুসাফির। ৭. যাকাতদাতার দরিদ্র ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজী, ভগ্নিপতি, ভাগিনা-ভাগিনী, চাচা-চাচী, খালা-খালু, ফুফা-ফুফু, মামা-মামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, জামাই, সৎ পিতা ও সৎ মাতা ইত্যাদি। ৮. যাকাত দাতার দরিদ্র চাকর নওকর বা কর্মচারী।– সূরা তওবা ৬০, আদদুররুল মুখতার ৩/২৯৮।

সদকাতুল ফিতর

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যদি কারো নিকট ৭.৫ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রূপা অথবা সমপরিমাণ মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য বা তরল (নগদ) অর্থ থাকে তাহলে বৎসর অতিক্রান্ত না হলেও তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। **(৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

আবনায়ে রাহমানিয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসায় রাহমানিয়ার শ্রদ্ধেয় মুহতামিম হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান দা.বা. ও শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। দেশব্যাপী আলেমসমাজ ও দীনদার জনসাধারণের জন্য উপকারী হবে ভেবে বয়ান দু'টি পত্রিকাস্থ করা হল। -সম্পাদক

বিনয়ীরাই কেবল ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে

মাওলানা হিফজুর রহমান (মুমিনপুরী হুযূর দা.বা.)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

আমার প্রাণপ্রিয় আবনায়ে জামি'আ রাহমানিয়া!

আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। জামি'আর আসাতিযায়ে কেরাম অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ, জামি'আ রাহমানিয়ার সন্তানেরা দীর্ঘদিন পর তাদের মায়ের কাছে, 'মাদারে ইলমী'র কাছে ফিরে এসেছে। সন্তানেরা মা থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকার পর যখন তাদের পরস্পরে সাক্ষাত ঘটে তখন মা ও সন্তানের আনন্দের কোন সীমা থাকে না। আজ জামি'আর আসাতিযায়ে কেরামের সাথে আবনায়ে জামি'আ রাহমানিয়া একই স্থানে সমবেত হয়েছে। এ আনন্দের কোন সীমা নেই। ভাষা জানি না, ব্যক্ত করতে পারি না, সেজন্য এর গভিরতাও প্রকাশ করতে পারছি না। এতটুকু বললাম যে, আজ তোমাদের উপস্থিতিতে আমরা সীমাহীন আনন্দিত। আলহামদুলিল্লাহ।

বহু বিচ্ছেদের ঘটনার পর, বহু ঝড় তুফানের পর আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়াকে পরস্পরে 'রবত' ও সম্পর্ক মজবুত করার তাওফীক দান করেছেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থির কথা তোমরা জানো। ইসলামের বিরুদ্ধে, যত ধরনের ষড়যন্ত্র হতে পারে তার সব কিছুই করা হচ্ছে। কিভাবে ইসলামী শিক্ষাকে মিটিয়ে দেয়া যায়, এদেশ থেকে উলামায়ে কেরামকে কিভাবে উৎখাত করা যায় তার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন ইলমে নববীকে, দীনে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই লাখো কোটি মানুষের মধ্য হতে বাছাই করে তোমাদেরকে নিজের সৈনিক হিসেবে তৈরি করেছেন। সুতরাং যদি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার জন্য তোমাদের এই 'রবত' ও ঐক্যের সম্পর্ক সর্বদা বজায় থাকে, আমি আশা করি, যত বড় ষড়যন্ত্রই হোক ইসলামের বিরুদ্ধে উলামায়ে হাক্কানী কিংবা কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে; সমস্ত ষড়যন্ত্র ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আশাবাদী যে, আবনায়ে জামি'আ রাহমানিয়ার নামে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে শুধু এই ঐক্যও যদি বহাল থাকে তাহলে বাংলার জমিনে কোন বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

ঐক্যের মূল ভিত্তি

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. তাওয়াযু' ও বিনয়কে ঐক্যের মূল ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাই প্রত্যেকে নিজের মধ্যে নম্রতা পোষণ করতে হবে। যারা যখন মুরুব্বী থাকবেন, যে যখন আমীর থাকবে, তাদেরকে মানার যোগ্যতা থাকতে হবে। আমাদের প্রত্যেকে যদি বিনয়ী হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ কোন ষড়যন্ত্র এই ঐক্য ভাঙতে পারবে না। কারণ সমস্ত অনৈক্যের মূল হলো, অহংকার। যে নিজেকে বড় মনে করে, নিজের মতকে সঠিক মনে করে তার দ্বারা কখনও ঐক্য হতে পারে না। এ কারণেই বাংলার জমিনে দেখা যাচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে, কুরআনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অথচ অন্য কোন রাষ্ট্রে বোধ হয় এত উলামায়ে কেরাম নেই। তা সত্ত্বেও এই দেশে সবচেয়ে বেশি ষড়যন্ত্র হয় ইসলামের বিরুদ্ধে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধে। এ দেশের উলামায়ে কেরামের মধ্যে যদি ঐক্য থাকতো তাহলে ইসলামের জন্য ময়দানে মিছিল করার, আন্দোলন করার কোনও প্রয়োজন হতো না। শুধু প্রত্যেকে নিজের স্থান থেকে একটা হুংকার দিলেই বাতিলের সমস্ত ষড়যন্ত্র ধুলিস্যাৎ হয়ে যেত। কিন্তু সেটারই আজ বড় অভাব। প্রত্যেকে নিজেকে বড় এবং সঠিক মনে করার কারণে আজ বাংলাদেশে ইসলাম এবং উলামায়ে কেরাম বিপদগ্রস্ত ও ফেতনার সম্মুখীন। আমরা তোমাদের কাছে আশাবাদী, জামি'আ রাহমানিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম এবং মুরুব্বীদের আহ্বানে যখন যে পদক্ষেপ নেয়া হবে আবনায়ে জামি'আ রাহমানিয়া সে আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একমত হবে এবং নিজের স্থান থেকে সকলে একসঙ্গে সে পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ বাতিল নিশ্চিহ্ন ও ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। তাদের কোন অস্তিত্বই বাকী থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

সাফল্যের পূর্বশর্ত

যে কোন পদক্ষেপে সফলতার জন্য দু'টি জিনিস জরুরী। সবর ও তাকওয়া। এ দু'টি জিনিস যদি একত্রে পাওয়া যায় তাহলে ব্যর্থতার প্রশ্নই আসে না। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا.

ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র কখনও তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না, যদি এই দুই গুণ তোমরা অর্জন করতে পারো। প্রথম গুণটি হলো সবর। দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত মানার উপর দৃঢ় ও অটল থাকা। আর দ্বিতীয় গুণটি হলো তাকওয়া। এই দুই গুণ থাকলে মুসলিম জাতি কখনও বাতিলের মোকাবেলায় পরাজিত হবে না; জিতবেই জিতবে।

ইতিহাস যদি দেখা হয়, উহুদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর আবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল প্রথম গুণে ত্রুটি হওয়ার কারণে। একটি দলের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম ছিল, মুসলিম বাহিনী জয়ী হোক বা পরাজিত তোমরা এই ঘাঁটি থেকে হটবে না। কিন্তু সেখানে তারা ইজতেহাদ করে যখন সরে গেল সেটাই পরাজয়ের কারণ হল। আমাদের দেশে এই গুণের বড় অভাব। যে কোন বড় আন্দোলন ঐক্যবদ্ধভাবে শুরু হয়। দু'দিন যেতেই বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হতে থাকে। এক পর্যায়ে না আন্দোলনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়, আর না দলের। ছোট একটা ফেরকাতে পরিণত হয়। এর কারণ হল, এসব আন্দোলনে মূল আমীরের সাথে সাধারণ কর্মীদের যোগাযোগ হয় না। এ কারণে কিছু নেতা মনে করে, সবার উপরে আমার নেতৃত্ব। নাম-ধাম সব আমারই। এই সুযোগে

তারা আমীরকে না জানিয়ে নিজেরা এক একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে তা পরাজয় এবং বিভেদের কারণ হয় এবং পুরো জাতির উপর বিরাট মুসিবত ও বিপদ নেমে আসে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

দ্বিতীয় গুণ ছিল তাকওয়া। এটা অর্জন করা জরুরী। এই বিষয়টির অভাব ছিল হুনাইনের যুদ্ধে। যে কারণে এই যুদ্ধে শুরু অবস্থায় মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ কুরআনে কারীমে এসেছে,

إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ.

সংখ্যাধিক্যের দিকে তাদের নজর ছিল। হাওয়াযেন গোত্রের মাত্র চার হাজার সৈনিকের মোকাবেলায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বারো হাজার। তাকওয়ার অভাবে সংখ্যার আধিক্যের দিকে নজর রাখায় শুরুর দিকে আল্লাহর হুকুমে পরাজয়ের অবস্থা হয়েছিল। সুতরাং সংখ্যা লক্ষণীয় নয়; তাকওয়াই হলো বড় সম্পদ।

আমাদের আকাবিরে দীনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাকওয়ার দৌলত যার মধ্যে ছিল, সকলে তার দিকে ধাবিত হয়েছে। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। কিন্তু তার কথা বোঝা যেত না। অথচ সকলেই কিভাবে তার ডাকে ছুটে গিয়েছিল। তিনি তওবার রাজনীতিতে নেমেছিলেন। তার ডাকে সবাই তওবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো। সারা দেশে মানুষ তার জন্য পাগল ছিলো। কিসের শক্তি ছিল তার? তিনি প্রকৃত তাকওয়ার দৌলত অর্জন করেছিলেন।

প্রকৃত তাকওয়া

এখন প্রশ্ন হলো, এই তাকওয়ার দৌলত কোথায় পাওয়া যাবে? মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাকওয়া অর্জন করার হুকুম দিয়েছেন। তাকওয়া কোথায় পাওয়া যাবে, সে পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন,

اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

একমাত্র সাদেকীন তথা আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের সোহবত ছাড়া যে যতো বড়ই শাইখুল হাদীস হোক অথবা যতো বড় মুফাসসির বা মুহাদ্দিস হোক কিংবা নামকরা মুফতী হোক এসব যোগ্যতা দ্বারা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে কোনও আল্লাহওয়ালার কাছে পরিপূর্ণ হাওয়ালা না করা হয়।

আল্লাহ ওয়ালা আমরা কোথায় পাবো? যেহেতু প্রত্যেক যুগের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অর্জনের হুকুম করেছেন তাই প্রত্যেক যুগেই আমার প্রয়োজন অনুযায়ী মুরুব্বীর সন্ধান পাওয়া যাবে। আমার ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির জন্য যখন যে স্থানে যে পর্যায়ের মুরুব্বীর প্রয়োজন হবে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানে এমন মুরুব্বী মিলবে। কাজেই পিছনের দিকে তাকালে লাভ হবে না যে, অমুক বুযুর্গের মতো কাউকে তো এখন পাচ্ছি না; বরং আমার জন্য যে পর্যায়ের মুরুব্বী আবশ্যক, অবশ্যই এই পৃথিবীর বুকে, এ বাংলার জমিনে পাওয়া যাবে।

আমাদের প্রত্যাশা

আবনায়ে জামি'আ রাহমানিয়ার কাছে আমার প্রত্যাশা, তোমরা সকলে এই দুই গুণ অর্জনের চেষ্টা করবে। প্রথমতঃ বড়দের পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া; ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত না নেয়া। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্ক করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তাকওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। এই দুই গুণ যদি অর্জন হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের ঐক্য ঠিক থাকবে। পাশাপাশি আবনায়ে জামি'আ রাহমানিয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকবে। *রাবেতার* সাথে জাতির *রবত* (সম্পর্ক) বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর নুসরত শুরু হয়ে যাবে।

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। কাজেই আসাতিযায়ে কেরাম যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই লক্ষ্যে তাদের অধীনে থেকে তাদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তোমরা সামনে অগ্রসর হও। এ আশাবাদ ব্যক্ত করে তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলের কাছে দু'আ চাই, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদেরকে দীনের উপর, হক্বের উপর মজবুত থাকার তাওফীক দান করেন। সাথে সাথে আজ যেমন আমরা জামি'আতুল আবরার মসজিদ ও মাদরাসা কমপ্লেক্সে মসজিদের নীচে এই ছায়াতলে সমবেত হয়েছি, আল্লাহ তাঁর আরশের নীচেও যেন আমাদেরকে এভাবে একসঙ্গে বসার ও সমবেত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

শ্রুতিলিখন, মাওলানা সা'দ আরাফাত
শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া
চরওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা।

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

আর সুন্নাহ পরিত্যাগ করার পরিণাম ব্যর্থতা ও ধ্বংস বলে উল্লেখ করেছেন। আর দৃশ্যত তারা যে হাদীস পরিত্যাগ করেছেন বলে মনে হয়, তার কারণ আমরা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কলম থেকে জানতে পারলাম। যার দশটি কারণের আটটিই হল ইজতিহাদী ইখতিলাফ। তাই যেকোনো একজনের মতকে সুনিশ্চিভাবে সহীহ বলা অসম্ভব আবার ভুল বলাও অসম্ভব। ফলে তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবে সহীহ হলে তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন, আর বাস্তবে সহীহ না হলেও তারা অবশ্যই একটি সওয়াব পাবেন।

দু'টি কারণ তথা হাদীস সম্পর্কে অবহিত না হওয়া ও হাদীস ভুলে যাওয়া, এ দু'টি খুবই নাদের ও বিরল। যা কেবল নাদের ও বিরল বিষয়ের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাই ইবনে তাইমিয়ার কথা থেকে কারও জন্য এই স্বার্থসিদ্ধির কোনও সুযোগ নেই যে, প্রতিদিনের বারবার পালনীয় বা প্রসিদ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে ইমামের মতামত দৃশ্যত কোনো হাদীসের বিপরীত পেলেই চিন্তাভাবনা ছাড়া অকপটে বলে দিবে যে, ঐ ইমামের নিকট এ বিষয়ের হাদীস পৌঁছেনি বা তিনি হাদীস ভুলে গেছেন এটা স্পষ্ট বোকামী।

স্বয়ং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মত ব্যক্তি যেখানে নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করে গিয়েছেন যে, 'ইজতিহাদের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত, আর আমরা ইমামগণের সীনায় যত ইলম ছিল তার সব জানতে সক্ষম হইনি' সেখানে আমাদের মত স্বল্প জ্ঞান ও স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ইমামগণের ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে ইবনে তাইমিয়ার এই স্বীকারোক্তিটা সামনে নিয়ে বলা। বিশেষ করে যেসব ভাই আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. কে নিজেদের অন্যতম অনুসরণীয় ব্যক্তি বলে কথাবার্তায় ও ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করেন, তাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ, আপনারা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর শুধু কিছু বিষয়ের প্রতি নযর না রেখে তার সামগ্রিক বিষয়ের প্রতি নযর রাখুন; ইবনে তাইমিয়ার রচনাটি মূলত আপনাদের জন্যই। এটা সংগ্রহ করুন এবং বারবার পড়ুন। ইনশাআল্লাহ উম্মাহের সর্বজন স্বীকৃত ইমামগণের প্রতি অমূলক মন্তব্য করা হতে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে হেফাযত করবেন এবং তাদের অবস্থান ভারে আপনাদের মাথা নত হয়ে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে ক্ষমা করুন ও সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন ॥

বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তা'আল্লুক মা'আল্লাহ

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক

হামদ ও সালাতের পর...
আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!
মহান রাব্বুল আলামীনের অপার করুণা আর অশেষ মেহেরবানী যে, দীর্ঘদিন পর তিনি তোমাদের সাথে আমাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন। একত্রিত হওয়ার ও এক মজলিসে বসার তাওফীক দান করেছেন। পরিচিত মুখগুলো দেখার এবং আপন হয়ে কিছু বলার এক সুন্দরতম সুযোগ দান করেছেন। এজন্য তাঁর সীমাহীন শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। দু'আ করি তিনি এ নেয়ামত কায়েম ও দায়েম রাখেন। দেখা-সাক্ষাত ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার এ চেষ্টাকে সদা সচল রাখেন। আমীন ॥

পিতা-মাতার হকের মতোই আসাতিযায়ে কেরামের হক

পিতা-মাতার প্রতি প্রিয়তম সন্তানের যে অধিকার, আসাতিযায়ে কেরামের প্রতিও তালেবে ইলমদের সেই অধিকার। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় যেমন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সেবা, আরাম আয়েশের ফিকির ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় এবং দূরে হলে দেখা-সাক্ষাত ও আন্তরিকতার ধারা চালু রাখতে হয়। আবার তাদের মৃত্যুর পর মাগফিরাত কামনা, সওয়াব রেসানী ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য সহযোগিতা করা হয় এবং ঋণগ্রস্ত হলে পরিশোধের ব্যবস্থা, বৈধ অসিয়ত পূরণ এবং মাঝে মধ্যে গুরুত্বের সাথে তাদের কবর যিয়ারতও করতে হয়। ঠিক তেমনি আসাতিযায়ে কেরামের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর সমান গুরুত্ব দিয়ে এসব কর্তব্য পালন করা তালিবে ইলমের উপরও জরুরী। বিশেষত পিতা-মাতার জীবদ্দশায় যেমন তাদের জীবন্ত যিয়ারত ও মৃত্যুর পর কবর যিয়ারত জরুরী, তেমনি আসাতিযায়ে কেরামের জীবদ্দশায় তাদের জীবন্ত যিয়ারত ও মৃত্যুর পর তাদের কবর যিয়ারত অতীব জরুরী একটি বিষয়। যিয়ারত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। হয়তো জীবন্ত যিয়ারত; নয়তো কবর যিয়ারত। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া আমাদেরকে সে ব্যবস্থা করে দেয়ায় রাবেতার সকলকে শুকরিয়া ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তা'আল্লুক মা'আল্লাহ

'তা'আল্লুক মা'আল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনই হলো আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও পরম লক্ষ্য। যার পর মুমিনের আর কোনও চাওয়া-পাওয়া, আর কোনও আশা-প্রত্যাশা থাকতে পারে না। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক না হলে সবকিছুই ব্যর্থ। এখন ভাবার বিষয় হল, আল্লাহর সাথে আমাদের এই সম্পর্ক ও ভালোবাসা কতোটা গভীর? কতটুকু নিখাদ, নির্ভেজাল ও জোরালো? তাঁর আদেশ-নিষেধ আমরা কতোটা মেনে চলছি? সত্যিই কি তাঁর প্রতি, নেক আমলের প্রতি দিন দিন আমাদের যিকির-ফিকির, ধ্যান-খেয়াল বাড়ছে; না গুনাহের বেড়াজালে ক্রমান্বয়ে তা আরও কমে আসছে? এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত জরুরী। যত্ন সহকারে এর মুহাসাবা হওয়া উচিত। বাস্তব কথা হল, এই হিসাব গ্রহণ একাকী কখনও সম্ভব নয়। এর জন্য একজন প্রকৃত সোহবতপ্রাপ্ত আল্লাহওয়ালা শাইখের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। আত্মশুদ্ধির জন্য যার কাছে নিজেকে মিটিয়ে দিতে হবে, নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় অবস্থা তাকে অবহিত করতে হবে এবং নিয়মিত তার সোহবতে বসা ও তার কিতাবাদি মুতালা'আ করতে হবে। কিন্তু কথা হলো, আমরা কি এ ব্যাপারে সচেতন? নিজেকে জিজ্ঞেস করি। একাকী চোখ বুঁজে বাস্তবতা উপলব্ধি করি। আমি কি আমার মধ্যে তওবা, খোদাভীতি, দুনিয়া বিমুখতা, সবর, শোকর, ইখলাস, তাওয়াযু'য়ের মতো মহৎ গুণাবলীর কোন একটি খুঁজে পাই? নাকি আমার মধ্যে লোভ, ক্রোধ, বুখল, হাসাদ, তাকাব্বুর, রিয়ার মতো জঘন্য জীবন ও ঈমান বিধ্বংসী মারাত্মক সব মন্দ গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

প্রত্যেকে নিজেকে খুব ভালোভাবে জিজ্ঞেস করি। আল্লাহ না করুন প্রথম প্রকারের গুণগুলো অর্জিত না হলে আর দ্বিতীয় সারির বদগুণগুলো থেকে মুক্ত না হলে জীবনের ষোল আনাই মিছে। দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহান বরবাদ। বুখারী শরীফের হাদীস সকলেরই জানা। যে জবরদস্ত মহা আলেম জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছে দীন ইসলাম ও ইলমের খেদমতে, সারা জীবন কাটিয়েছে দীনের মেহনত মুজাহাদা আর কঠিনতর অধ্যবসায়ে। সেই হতভাগ্য হলো সর্বপ্রথম জাহান্নামী! কেননা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তরের কোনও রোগ দূর করানোর ফিকির তার ছিলো না। শাইখের মাধ্যমে নিজের দেখভাল আর নফসের জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা সে করেনি।

আমি একজন আলেম, মুদাররিস, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, প্রখ্যাত মুফাসসির, খতীব, ইমাম(!)। কিন্তু আমি যশ-খ্যাতির লিপ্সায় বিভোর কি না? গীবত, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, চোগলখুরীতে লিপ্ত কি না? নিজের ষোল আনা দোষে ডুবেও পরের দোষ তালাশে ব্যস্ত কি না? কারও পিছু লেগে আছি কি না? আর এসব গুনাহকে দীনের খায়েরখাহী ভেবে জায়েয মনে করছি কি না?

সাবধান! নিজেকে ধ্বংস করে, নিজে গুনাহে লিপ্ত হয়ে তুমি দীনের কল্যাণ কামনা করবে- শরীয়তে এমন কোনও মাসআলাই নেই। আফসোস! আমাদের কিসমতেই আল্লাহ তা'আলা এগুলো বেশি রেখেছেন। আমরা আর কিছুতে দক্ষ না হলেও এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে বেশ পটু। এ অবস্থায় আমাদের ওয়াজ-নসীহত, মেহনত-মুজাহাদা ইত্যাদি দ্বারা জনগণের কতটুকু ফায়দা হবে? আমাদের তাকরীর-লেকচার দ্বারা ছাত্রদের কী ইলম হাসিল হবে? কেমন ওলী-আল্লাহ পয়দা হবে? ওরা আঁড়ালে বলবে, গোপনে ভাববে। আরে উস্তাদজী তো আমার চেয়ে বেশি গুনাহগার, চোগলখোর, হিংসুক, পরনিন্দাকারী, খ্যাতির কাঙাল, ওয়াদাভঙ্গকারী! এ সব বিপদ থেকে বাঁচতে চাইলে আমাদেরকে কোনও সোহবতপ্রাপ্ত শাইখের হাতে নিজের নেগরানী আর নফসের জবাবদিহিতার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করাতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। হাদীসের ইরশাদ, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৯৩)

কুরআনের বাণী, (অর্থ) 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং

সৎকর্ম পরায়ণদের সংশ্রব অবলম্বন করো। (সূরা তাওবা- ১১৯)

যে ব্যক্তি আত্মার সংশোধন করেছে সে ব্যক্তিই সফলতা লাভ করেছে। (সূরা শামস- ৯)

এর চেয়ে আর গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার কাছে নেই।

উলামায়ে উম্মতের কিছু দায়িত্ব সার্বক্ষণিক আর কিছু তাৎক্ষণিক

দাওয়াত-তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়ার সব ক'টি নিয়ে সকলকে চলতে হবে। 'উলামাগণ নবীদের ওয়ারিস'। তাই উলামায়ে কেরাম একই সঙ্গে নববী সকল যিম্মাদারীরই ওয়ারিস। এককভাবে শুধু একটির ওয়ারিস নয়। সুতরাং কেউ তাবলীগের, কেউ তা'লীমের আর কেউ তাযকিয়ার ওয়ারিস হবে এমনটি কখনও নয়। সর্বদা সমানভাবে সবগুলোর যিম্মাদারী পালন করে নিয়াবাতে নবীর সঠিক দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দিতে হবে। এটা হলো উলামায়ে উম্মতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। উলামায়ে উম্মতের ওয়াক্তী বা তাৎক্ষণিক দায়িত্ব বিষয়ক একটি হাদীস শুনুন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين.

অর্থ : প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরাই (কিতাব ও সুন্নাহর) এই ইলমকে গ্রহণ করবেন। যারা এটা হতে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিল সম্প্রদায়ের মিথ্যারোপ ও জাহেল-মূর্খদের ফালতু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে দূর করবেন। (ইমাম বাইহাকী কৃত আলমাদখাল)

আলোচ্য হাদীসের تحريف الغالين তথা দীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী দ্বারা বর্তমানে উদ্দেশ্য হল, রেজভী সম্প্রদায়। পাশাপাশি লা-মাযহাবী তথা গাইরে মুকাল্লিদীনও। যারা বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক উপদ্রব হয়ে দেখা দিয়েছে। এদের কর্মকাণ্ডে অবাক হতে হয়, আশ্চর্যবোধ হয়! সম্প্রদায়টি কথায় কথায় বুখারী শরীফের রেফারেন্স টেনে থাকে। যেন একমাত্র বুখারী শরীফই প্রামাণ্য কিতাব। অথচ এদের কর্মকাণ্ডেই এরা বুখারী শরীফের পাক্কা দুশমন; অমান্যকারী। একাধিক বিষয়ে এরা সরাসরি বুখারী অমান্যকারী। যথা,

১. বুখারীর বর্ণনা : কাযা নামায পড়তে হবে।

তাদের বক্তব্য : কাযা নামায পড়তে হবে না।

২. বুখারীর বর্ণনা : একই দিনে ঈদ ও জুমু'আ অনুষ্ঠিত হলে উভয় নামাযই পড়তে হবে।

তাদের বক্তব্য : শুধুমাত্র ঈদের নামায পড়তে হবে, জুমু'আ পড়তে হবে না।

৩. বুখারীর বর্ণনা : নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরতে হবে।

তাদের বক্তব্য : মহিলাদের মতো বুকে হাতের উপর হাত রাখতে হবে।

৪. বুখারীর বর্ণনা : তিন তালাকে তিন তালাকই প্রযোজ্য হবে।

তাদের বক্তব্য : তিন তালাকে এক তালাক প্রযোজ্য হবে।

৫. বুখারীর বর্ণনা : পরস্পরে দুই হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করা।

তাদের বক্তব্য : এক হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করাই যথেষ্ট।

বুখারীতে এমন আরও বিষয় আছে যার বিপরীত মত পোষণ করে আহলে হাদীস নামক এই সম্প্রদায়টি। এরা আসলে বুখারী শরীফকে মানে না। বরং নফসের পূজায় ব্যস্ত। তাদের মান্যবর (?) হলেন তিনজন। (এক) ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. (দুই) আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযী রহ. (তিন) ইবনে হাযম যাহেরী রহ.। কিন্তু কথা হল, এরা এদেরকেও পরিপূর্ণ অনুসরণ করে না। যখন যাকে মনে ধরে তখন তাকে কিছুটা অনুসরণ করে। আর বাকিদেরকে বর্জন করে। মৌলিকভাবে কাউকেই তারা অনুসরণ করে না, নফসের পূজা করে বেড়ায় আর লোকদেরকে গোমরাহ করতে থাকে।

হাদীসের অন্য অংশ تأويل الجاهلين মূর্খদের অযথা ব্যাখ্যা। এর বর্তমান নমুনা হল, মওদুদীবাদী ও জাকির নায়েকদের মত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড। আর انتحال المبطلين দ্বারা অন্যান্য বাতিল সম্প্রদায় যারা উম্মতে মুহাম্মদীর ঈমান, আমল, আকীদা, বিশ্বাসকে ধ্বংসের জন্য সর্বদা মারাত্মক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে। আর জনসাধারণকে জাহান্নামী বানাচ্ছে। যেমন, মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান মিশনারী, কাদিয়ানী ইত্যাদি।

তো উলামায়ে উম্মতের ওয়াক্তী বা তাৎক্ষণিক দায়িত্ব হলো, এসব বাতিল ফেরকা ও ভ্রান্ত সম্প্রদায় থেকে জনসাধারণকে সচেতন করা। তাদের ঈমান-আমল, আকীদা-বিশ্বাস হেফাযতের যথার্থ ফিকির করা। নয়তো উলামায়ে কেরাম জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। জনগণ আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয় করে ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা করবে। আমাদের মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দিবে। ছেলে-মেয়েদেরকে মাদরাসা বিমুখ করে তুলবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাহায্য-সহযোগিতা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিবে। খোদা না করুন আমাদের অবস্থাও ঠিক স্পেন, কর্ডোভা, রাশিয়ার মতো হয়ে যাবে। যেখানে শত শত বৎসর ইসলামী খেলাফত, লক্ষ লক্ষ উলামায়ে ইসলামের দীনী কারনামা থাকা সত্ত্বেও যখনই জনসাধারণ উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তখনই চিরচেনা আপন জনগণ পর হয়ে জঘন্য শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ধ্বংস করেছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ-মাদরাসাসহ দীনী সকল কর্ম-কীর্তি। শুধু তাই নয় তারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে উলামায়ে কেরামকেও শহীদ করে দিয়েছে।

এজন্য এ জাতীয় ফেৎনা থেকে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ হেফাযত করতে হবে। জনগণের কাছে তাদের বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে। আমাদের আকাবিরগণ এসব বাতিলের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাদের আসল চেহারা জনসম্মুখে প্রকাশ করেছেন। কোন কোন আকাবিরকে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে তাম্বীহ করেছেন, 'তুমি তাসবীহ নিয়ে বসে আছো, আর আমার খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে?' তখন তারা তাসবীহ সীমিত করে খতমে নবুওয়াতের উপর আঘাতকারী কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

মনে রেখো, তাবলীগ, তা'লীম, তাযকিয়া হলো উলামায়ে কেরামের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব আর যখন যে বাতিল সম্প্রদায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ দমন করা ও সে ব্যাপারে জনগণকে সাবধান করা হলো তাৎক্ষণিক দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ : আপনি বোঝাতে থাকুন কেননা বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে। (সূরা যারিয়াত- ৫৫)

মাদরাসার উন্নতি ও তারাক্কীর রহস্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. বলেছেন, তিনটি কাজ করা হলে আর্থিক অভাব অনটনসহ কোন অভাবই মাদরাসায় থাকবে না।

(এক) কুরআনুল কারীমের সহীহ তা'লীম। অনেকে নিয়মিত তিলাওয়াত করে তবে সহীহ-শুদ্ধ করে পড়ছে কি না সে দিকে আদৌ খেয়াল রাখে না। না উচ্চারণের বিবেচনা আছে, না গুণগত মান রক্ষা হচ্ছে, আর না ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে বিরত থাকা হচ্ছে। মা'রুফ-মাজহুলের পার্থক্য করে না।

(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাযহাবের মহান ইমামগণের উপর আরোপিত অপবাদের অপনোদন

মূল : আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.
ভাষ্য ও ভাষান্তর : মাওলানা আব্দুল মালেক

কুরআন হাদীসের জটিল ও দ্বিমুখী অর্থবহ বিষয়াদির সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান পেশ করে যারা গোটা উম্মাহর কুরাআন-হাদীসের আলোকে জীবন যাপনের পথকে সুগম করেছেন তারা হলেন এই উম্মাহর ইমাম। ইমামগণ ছিলেন উম্মাহর জন্য নিবেদিত প্রাণ। কুরআন সুন্নাহের প্রতি তাদের আগ্রহ ও আসক্তির কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। কিছু অবুঝ ভাই উম্মাহর সর্বজন স্বীকৃত এই ইমামগণের ব্যাপারে এমন সব মন্তব্য করেছেন যা একজন সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রে করাও বড় দুঃখজনক ব্যাপার। বিশেষ করে তাদের প্রতি এই অপবাদ দেয়া যে, তারা হাদীস বেশি জানতেন না, হাদীস বাদ দিয়ে তারা কিয়াসের উপর আমল করেছেন। এগুলোকে তাদের অজ্ঞতা ও হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ বলা চলে। তবে এই ফেতনা আজকের নয়, বহু আগ থেকেই চলে আসছে। এদেরকে 'ঠাণ্ডা' করতে বহু হক্কানী উলামায়ে কেরাম শুরু থেকেই কলম হাতে নিয়েছেন। ৭ম ৮ম শতকের মহামনীষী আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এ বিষয়ে *রফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম* নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করছেন।

বিশিষ্ট ইমামদের উপর উত্থাপিত অভিযোগের খণ্ডন

এ প্রবন্ধে আমরা আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার উক্ত কিতাবের কিছু চুম্বকাংশ পেশ করবো। তবে এর পূর্বে ইমামগণের নিকট হাদীসের মর্যাদা ও অবস্থান কেমন ছিল এবং হাদীসের উপর আমল করার প্রতি তাদের আগ্রহ ও গুরুত্ব কত বেশি ছিল তা স্বয়ং ইমামগণের ভাষায়ই তুলে ধরবো।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, (অর্থ) 'মানুষের মাঝে যত দিন হাদীস অন্বেষণকারী থাকবে মানুষ ততদিন কল্যাণ ও নিরাপত্তায় থাকবে। মানুষ যখন হাদীস ভিন্ন অন্য জ্ঞান অন্বেষণ করবে, তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

তিনি আরো বলেন, (অর্থ) 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার দীনের ক্ষেত্রে নিজস্ব মত প্রদানে বিরত থাক এবং রাসূলের সুন্নাহকে মজবুতভাবে অনুসরণ কর, যে ব্যক্তি সুন্নাহ পরিত্যাগ করবে সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।' (মীযানুল কুবরা, শা'রানী ১/৫১)

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, (অর্থ) 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করে তার খেলাফ মত প্রদান করলে কোন্ যমীন আমাকে রহম করবে?' (*খাতিমাতু মিফতাহিল জান্নাহ ফিল ইজতিহাদি বিসসুন্নাহ*)

ইমাম মালেক রহ. বলেন, (অর্থ) 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহসমূহ নূহ আ. এর নৌকার ন্যায়। যে তাতে আরোহন করবে, সে নাজাত পাবে। আর যে তা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে।'

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, (অর্থ) 'যে ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস (সুন্নাহ) প্রত্যাখ্যান করেছে সে তো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে'। (মানাকিবুল ইমাম আহমাদ; পৃষ্ঠা ১৮২)

এছাড়া সিয়ার ও তারীখের কিতাবসমূহে তাদের এ ধরনের উক্তি ভরপুর। ইমামগণের এসব উক্তির সারকথা হল, হাদীস গ্রহণে ও পালনেই নাজাত। আর হাদীস পরিহারে ধ্বংস অনিবার্য। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ইমামগণের নিকট হাদীসের গুরুত্ব কত বেশি ছিল।

এরপরও তাদের উপর এই অপবাদ আরোপ করা যে, তারা হাদীস পরিত্যাগ করেছেন, খুবই আশ্চর্যজনক। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এসব অপবাদ ও অমূলক উক্তির খণ্ডনে লিখেন,

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته؛ دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

'জেনে রাখা উচিত, উম্মাহর নিকট ব্যাপকভাবে মকবূল ও সমাদৃত ইমামগণের কেউই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট বড় কোনো সুন্নাতেরই ইচ্ছাকৃত কোনো বিরোধিতা করেননি। কারণ ইমামগণ দু'টি বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে একমত হয়েছেন, **(এক)** নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত্তেবা-অনুসরণ ওয়াজিব। **(দুই)** মানুষের সব কথা গ্রহণযোগ্য হবে না ঠিক কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কথাই গ্রহণ করা হবে।

তবে কোনো ইমাম থেকে যদি এমন মত পাওয়া যায় যা সহীহ হাদীসের সাথে বাহ্যত বিরোধপূর্ণ মনে হয়, তবে বুঝতে হবে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে তার কোনো ওযর বা কৈফিয়ত আছে। তাদের সকল ওযর মৌলিকভাবে তিন ধরনের।

(ক) মুজতাহিদ (কুরআন-হাদীসে পারদর্শী ব্যক্তি) ইমামের জানামতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে এমনটি বলেননি।

(খ) মুজতাহিদ ইমামের মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস দ্বারা এই মাসআলা বুঝানোর ইচ্ছা করেননি।

(গ) মুজতাহিদের মতে ঐ হাদীসটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, এই তিন প্রকার ওযরের পিছনে আবার অনেক কারণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বিস্তারিতভাবে দশটি কারণ আলোচনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে সেগুলো পেশ করা হল,

১. হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত না হওয়া।

অনেক ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামের নিকট সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ের হাদীস পৌঁছে না। তখন তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমাধান কুরআনের কোন আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বা তার জানা কোন হাদীসের মাধ্যমে

দেন। অনেক ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, কিয়াসের মাধ্যমেও দেন। এতে পেশ করা সমাধান মুজতাহিদের অজানা হাদীসের সাথে কখনো বিরোধপূর্ণ হয়, অনেক ক্ষেত্রে আবার সঙ্গতিপূর্ণও হয়। কিন্তু মুজতাহিদের কাছে যেহেতু হাদীসটি পৌঁছেনি তাই তার দেয়া সমাধান হাদীসটির সাথে বিরোধপূর্ণ হলেও তার উপর কোন অভিযোগ উত্থাপিত হবে না। কারণ হাদীসটি অজানা থাকায় সে অনুযায়ী সমাধান পেশ করার মুকাল্লাফ বা ভারার্পিত নন তিনি।

(আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন,) সালাফ বা অতীত ইমামদের যেসব মত হাদীসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ পাওয়া যায় তার অধিকাংশ এ কারণেই।

এমনটি ঘটা বিরল কিছু না। খুলাফায়ে রাশেদীন থেকেও এমন ঘটনার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, অথচ তারা ছিলেন হাদীস বিষয়ে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।

হযরত আবু বকর রাযি. কে দাদীর মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই বিষয়ে কুরআনে তো কিছু নেই। সুন্নাহতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু আছে কি না আমার জানা নেই। তবে আমি অন্যদেরকে জিজ্ঞাস করবো। এরপর তিনি অন্যান্য সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাস করলেন। তখন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। তো দেখুন, অন্যদের তুলনায় হযরত আবু বকরের হাদীস বেশি জানা থাকলেও এই বিষয়টি জানা ছিল না।

এভাবে হযরত উমর রাযি. বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি বিষয়ক একটি হাদীস হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে জানেন।

আর হযরত উসমান রাযি. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করার হাদীসটি জানেন ফুহায়রা বিনতে মালেকের মাধ্যমে।

হযরত আলী রাযি. স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত যে সন্তান প্রসব পর্যন্ত হবে এই হাদীসটি জানেন সুবাইআ আসলামিয়্যাহ রাযি. এর কাছ থেকে। এ ধরণের আরো অসংখ্য অগণিত উদাহরণ রয়েছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী তার *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* ও *আলইনসাফ* কিতাবে লিখেন, 'কিছু ব্যক্তি এই প্রথম কারণটি দ্বারা মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারা হাদীস অনুযায়ী আমল না করার অন্যান্য সব কারণ বাদ দিয়ে শুধু এটিকেই একমাত্র কারণ বানিয়ে নিয়েছেন। ফলে যেখানেই কোনো মুজতাহিদের মতামত বাহ্যিকভাবে হাদীসের খেলাফ মনে হয়, সেখানেই তারা ধরে নেন যে, এই হাদীসটি ঐ মুজতাহিদের নিকট পৌঁছেনি। এ পদক্ষেপ খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ।

আর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া সালাফের যেসব ঘটনা নকল করেছেন তা হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। সুতরাং এ কথা বলা যে, 'হাদীসের উপর আমল না করা অধিকাংশ সময় এ কারণে হয়' প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়। কারণ এমন ঘটনা খুব বেশি না, খুব বিরল এবং কদাচিৎ ঘটেছে।

তাছাড়া এই ওযরটি একাল সেকাল সবকালে ঐ সকল মাসআলার ক্ষেত্রেই বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত যার সম্মুখিন হতে হয় কালেভদ্রে। আর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বর্ণিত ঘটনাবলী এ কথারই প্রমাণ বহন করে। কিন্তু যে সকল মাসআলা দৈনন্দিনের, বারবার যার সম্মুখীন হতে হয় সেক্ষেত্রে তো এই কারণটি প্রয়োগযোগ্য না। যেমন ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া না পড়া, আমীন উঁচু আওয়াজে বলা বা নিম্ন স্বরে বলা, রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময় হাত উঠানো না উঠানো, আযান ইকামতে শব্দ কয়টি হবে? ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিদিন সবার সামনে বারবার আসে। সুতরাং এসব বিষয়ে সাহাবা, তাবেয়ীদের কাছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পৌঁছেনি বলা একেবারে মূর্খতা।

২. কোনো ইল্লতের কারণে হাদীসটি প্রামাণ্য না হওয়া।

'মুজতাহিদের নিকট হাদীস পৌঁছেছিল কিন্তু এই হাদীস তার কাছে ত্রুটিমুক্তভাবে প্রমাণিত ছিল না। কারণ ঐ হাদীসের কোনো রাবী হয়তবা তার নিকট মাজহুল (অজ্ঞাত) ছিল। অথবা মুত্তাহাম (মিথ্যায় অভিযুক্ত) ছিল বা সায়্যিয়ুল হিফয (স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ছিল। অথবা হাদীসটি তার কাছে মুনকাতে' (বিচ্ছিন্ন সনদে) পৌঁছেছে বা রাবী হাদীসের শব্দ যব্‌ত (আয়ত্ত) করতে পারেনি।

আরো আলোচনার পর তিনি লিখেন, কোন হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দেয়ার ঘটনা এ কারণেই খুব বেশি ঘটে। এ কারণটির উপস্থিতি প্রথম যুগের তুলনায় তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের থেকে নিয়ে প্রসিদ্ধ ইমামগণ ও তৎপরবর্তীদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। বলা যায় প্রথম কারণ থেকে এটিই বেশি বিদ্যমান।

৩. হাদীস সহীহ যঈফ হওয়ার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ।

একজন মুজতাহিদ তার গবেষণা অনুযায়ী এক হাদীসকে যঈফ বলেছেন অন্য মুজতাহিদ ঐ একই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হতে পারে যিনি যঈফ বলেছেন তার কথা ঠিক। কিংবা যিনি সহীহ বলেছেন তার কথা, বরং কারো কারো দৃষ্টিতে তো একই সাথে দুই মুজতাহিদের কথাই সঠিক। তাদের বক্তব্য হলো, كل مجتهد مصيب প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক এবং অভ্রান্ত।

৪. কিছু হাদীসে আমলযোগ্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী পরিপূর্ণ না পাওয়া।

আদেল (সৎ) এবং হাফেয (স্মৃতিশক্তির অধিকারী) এর সূত্রে বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ (বর্ণনা সূত্রের কোন পর্যায়ে একক বর্ণনাকারী থাকলে তাকে খবরে ওয়াহিদ বলে) দলীলযোগ্য হওয়ার জন্য মুজতাহিদ এমন কিছু শর্ত জুড়ে দেন যা অন্য মুজতাহিদের দৃষ্টিতে শর্ত না। যেমন কেউ শর্ত করেছে হাদীসটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে দেখতে হবে (অর্থাৎ সতঃসিদ্ধ বর্ণনার আলোকে এ ধরনের খবরে ওয়াহিদের অর্থ যাচাই করে দেখতে হবে)। তদ্রূপ কারো কারো নিকট শর্ত হলো, শরীয়তের স্বাভাবিক মূলনীতির সাথে বিরোধপূর্ণ হলে বর্ণনাকারী ফকীহ (হাদীসের মর্ম এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী) হওয়া।

কেউ বলেন, মানুষ ব্যাপকভাবে যে বিষয়ের সম্মুখিন হয় এমন বিষয়ের হাদীস হলে তা অসংখ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত হওয়া।

তো যে মুজতাহিদ যে পর্যায়ের হাদীস গ্রহণের জন্য যে শর্ত করেছেন তার অনুপস্থিতিতে তিনি তা গ্রহণ করতে অপারগ। এ কারণে হাদীসটির উপর আমল অনেক সময় ছেড়ে দেন। অথচ অন্য মুজতাহিদ দিব্যি সেই খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করছেন।

৫. হাদীস ভুলে যাওয়া।

'মুজতাহিদের কাছে হাদীস পৌঁছেছিল এবং হাদীসটি তার নিকট প্রমাণ-সিদ্ধও কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। যেমন, (ক) জুনুবী বা যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয তার জন্য তায়াম্মুমের বিধান বিষয়ক

হাদীস হযরত উমর রাযি. ভুলে গিয়েছিলেন। হযরত আম্মার রাযি. তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। (খ) হযরত উমর রাযি. একবার বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্যে তিনি বললেন, কেউ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ও মেয়েদের মহরের বেশি মহর ধার্য করতে পারবে না। এ সময় একজন মহিলা এই আয়াত পড়ে শুনালেন وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا হযরত উমর রাযি. তৎক্ষণাৎ এই আয়াত গ্রহণ করেন। ফয়সালার সময় তার এই আয়াতের কথা স্মরণ ছিল না। অথচ তিনি কুরআনের হাফেয ছিলেন। (গ) হযরত আলী রাযি. জঙ্গে জামালের সময় হযরত যুবাইর রাযি. কে তাদের দু'জনের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি যুদ্ধ হতে ফিরে আসেন।

আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. বলেন, মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কোনো বিশেষ সময়ে কোনো কিছু স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এ কথা সবার মনে রাখা উচিত যে, কোনো প্রমাণ ছাড়া কারো প্রতি ভুলের দাবি করা বড় ভুল। তারপরও ভুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে বিরল এবং কদাচিত ঘটা বিষয়ে। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উদাহরণ এর স্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু যে আমল প্রতিদিন বারবার করা হয় সেসব আমলের ক্ষেত্রে ভুলের দাবী করা নিতান্তই অমূলক। যেমন, অনেক জ্ঞান প্রতিবন্ধীকে বলতে শোনা যায়, রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের কথা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ভুলে গেছেন। অথচ রফয়ে ইয়াদাইন দৈনন্দিনের আমল। আর ইবনে মাসউদ রাযি. এর মতো ব্যক্তি যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম ছিলেন। যাকে বলা হয় 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা ও তাকিয়ার বাহক', যিনি সর্বদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন সেই তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করবে তা ভুলে যাবেন; কীভাবে সম্ভব?

৬. হাদীসের হেদায়াত-দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অনবহিত থাকা।

'মুজতাহিদ ইমামের হাদীসের মর্মার্থ জানা না থাকা। এটা কখনো এই জন্য হয় যে, হাদীসে যে শব্দটি এসেছে তা 'গরীব' (অপরিচিত) যেমন, মুখাবারাহ, মুযাবানাহ, মুহাকালাহ, মুলামাসাহ ইত্যাদি। আবার কখনো এজন্য হয় যে, মুজতাহিদের নিজ ভাষা ও পরিভাষায় ঐ শব্দের যে অর্থ হয় তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষার বিপরীত অর্থ। আর তিনি হাদীসকে নিজের ভাষার অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আবার কখনো এজন্য হয় যে, শব্দটি একাধিক অর্থবোধক বা দুর্বোধ্য, অথবা হাকীকত ও মাজায (আসল অর্থ ও রূপক অর্থ) উভয়ের সম্ভবনাময়। ফলে মুজতাহিদ ইমামের কাছে যে অর্থটা বেশি সহীহ মনে হয়েছে সেই অর্থের প্রয়োগ করেছেন অথচ হাদীসের উদ্দেশ্য আরেকটি ছিল।'

আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানবী বলেন, এই বিষয়টি বোধগম্য হয় না যে, মুজতাহিদ ইমামের হাদীসের মর্মার্থই জানা থাকবে না। কারণ ইজতিহাদের প্রথম শর্তই হল ভাষাজ্ঞান ও মর্ম উদ্ধারের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। সুতরাং এই ধরনের ব্যক্তি কীভাবে মুজতাহিদ হতে পারে? তাই এটিকে হাদীসের উপর আমল না করার কারণ বলা যায় না।

৭. হাদীসটি এই মাসআলা বুঝায় না।

মুজতাহিদের ধারণা এই হাদীস দিয়ে এই মাসআলা বুঝা যায় না।

এই কারণটি ও পূর্বের কারণটির মধ্যে পার্থক্য হল, ঐ সূরতে তিনি জানেন না যে, এই শব্দটি দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় বা যায় না। আর এই সপ্তম সূরতে শব্দের দ্বারা কোন অর্থ উদ্দেশ্য সেটা তো জানেন কিন্তু শরয়ী মূলনীতির আলোকে এই অর্থ ও মর্ম সহীহ বলে মনে হয় না, তাই এই হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দেন চাই বাস্তবে তার খেয়াল সহীহ হোক বা না হোক।

৮. কুরআন-হাদীসের বাণীর অর্থ ও মর্মের বিপরীতে দলীল থাকা।

'মুজতাহিদ ইমামের খেয়াল হল, এই নস বা পাঠের মর্মের বিপরীতে এমন কোন দলীল বিদ্যমান আছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই বাণীর এই অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেমন 'আম' এর বিপরীতে 'খাস' বিদ্যমান থাকা, মুতলাকের বিপরীতে মুকাইয়্যেদ থাকা, অথবা 'আম' এর বিপরীতে এমন জিনিস থাকা যা ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে। অতবা হাকীকতের বিপরীতে এমন করীনা বা লক্ষণ বিদ্যমান থাকা যা মাজাযের প্রমাণ বহন করে। এই জাতীয় আরো বিরোধপূর্ণ বহু প্রকার হতে পারে। এই প্রকারটি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেননা শাব্দিক বৈপরীত্য ও একমতকে অন্য মতের উপর প্রাধান্য দেয়া এক অকূল সমুদ্র তুল্য ব্যাপার।'

৯. যঈফ, রহিত কিংবা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়ার দলীল থাকায় (যে দলীলটি সব ইমামদের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে দলীল হওয়ার যোগ্য) কোন হাদীসের উপর আমল ছেড়ে দেয়া।

মুজতাহিদের দৃষ্টিতে হাদীসের বিপরীতে এমন সব দলীল বিদ্যমান যা হাদীসটি যঈফ বা মানসূখ কিংবা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়ার কথা বুঝায়। আর হাদীসের বিপরীত ঐ দলীলটি সর্বসম্মতিক্রমে হাদীসের প্রতিপক্ষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন কোনও আয়াত হাদীস বা ইজমা।

১০. যঈফ, রহিত কিংবা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হওয়ার ব্যাপারে দলীল থাকায় (তবে দলীলটি সবার দৃষ্টিতে দলীল হওয়ার যোগ্য নয়) কোন হাদীসের উপর আমল করা ছেড়ে দেয়া।

'হাদীসের বিপক্ষে এমন দলীল বিদ্যমান মনে করা ছেড়ে দেয়া হাদীসের যঈফ, মানসূখ বা ব্যাখ্য সাপেক্ষ হওয়া বুঝায়। এ দলীল অন্যদের নিকট মুআরিয বা বিপরীত হওয়ার যোগ্য না।

হাদীস তরকের এই দশটি কারণ উল্লেখ করার পর ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেন, 'এই দশটি কারণ তো খুবই স্পষ্ট। আর অনেক হাদীসের ক্ষেত্রে হয়তো মুজতাহিদ ইমামের নিকট হাদীসের উপর আমল না করার এমন সব দলীল থাকতে পারে যা আমরা জানতে সক্ষম হইনি। কেননা ইজতিহাদের ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত। আর আমরাতো আহলে ইলমের সীনায় যত ইলম আছে তার সব জানতেও সক্ষম হইনি।'

আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানবী বলেন, উল্লিখিত দশটি কারণের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় প্রথম প্রকার ও পঞ্চম প্রকার ছাড়া বাকী সবগুলোর মূল হল, ইজতিহাদী ইখতিলাফ। দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষকে এ কথা বলা অসম্ভব যে, তারা নিশ্চিত ভুলের উপর আছে। এছাড়া ভাবার বিষয় হল, ইলমের সাগর আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মত ব্যক্তির একথা বলা যে, 'ইজতিহাদের সকল ক্ষেত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়' এর দ্বারা ইজতিহাদের মান ও মাকামের উচ্চতা সম্পর্কে কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়।'

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমামগণের নিকট সুন্নাতের গুরুত্ব-মাহাত্ম ছিল অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য। তারা সবাই সুন্নাহ মানার মধ্যেই সফলতা ও নাজাত বলে মন্তব্য করেছেন। **(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী

মাওলানা জালীস মাহমূদ

হিজরী বারো শতক যদিও সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার যুগ (ইসলামী ইতিহাসের ছাত্ররা তা ভালোভাবেই জেনে থাকবে) বড় বড় প্রসিদ্ধ শাসনযন্ত্রে (যেমন, মোঘল সাম্রাজ্যে প্রত্যক্ষভাবে এবং খিলাফতে উসমানিয়াতে পরোক্ষভাবে) পতনের আলামত ফুটে উঠছিল। মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে এমনকি ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিজাযে পর্যন্ত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য মুসলিম রাজন্যবর্গের মাঝে পরস্পর লড়াই চলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিসর, সিরিয়া, ইয়ামান, হিজায, ইরান ও ভারতবর্ষে সর্বত্র পঠন-পাঠনে ব্যস্ত শিক্ষানুরাগী ও লেখালেখিতে তৎপর আলেম-উলামা এবং বিভিন্ন তরীকার পীর-মাশায়েখদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এমন স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন যার নযীর খুঁজে পাওয়া ভার। বারো শতকের মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তেমনি একজন বে-নযীর এ ব্যক্তিত্বের নাম হল শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.।

বারো শতকের মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিকভাবে হতাশা, অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের কালোমেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরক-বিদ'আত ঢুকে পড়েছিল। শিয়াদের অপতৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে। কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা থেকে মানুষ বহুদূরে সরে গিয়েছিল। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ভাষায়, 'মুসলিম বিশ্বে উত্থান পতন লক্ষ্য করা যেত। চরিত্র ও সমাজে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। অনারব অমুসলিমদের অনেক প্রথা-প্রচলন, রীতি-নীতি মুসলমানদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। শাসকদের মধ্যে নেতৃত্ব মোহ, আত্মম্ভরিতা এবং রাজ্যগুলোতে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল...। সঠিক একত্ববাদের সীমাতিক্রম, আউলিয়ায়ে কেরামের স্তুতি ও সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন, কবর পূজা এবং কোথাও কোথাও জঘন্য শিরকের চিত্রও পরিলক্ষিত হত।' (তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত; বঙ্গানুবাদ ৫/৩৩)

সাইয়েদ সুলাইমান নদভী তখনকার ভারতবর্ষের চিত্র এভাবে এঁকেছেন- 'মোঘল সালতানাতের সূর্য অস্তমিত প্রায়। মুসলমানদের মাঝে বিদ'আত এবং রুসূমাত ছড়িয়ে পড়েছিল। ভণ্ড পীর-ফকীররা অতীত বুযুর্গদের মসনদ দখল করে বসেছিল। মাদরাসাসমূহে মানতেক ও হিকমাতকে (যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র) প্রাধান্য দেয়া হত। মুফতীরা ফিকহ-ফাতওয়ার ভাসা ভাসা জ্ঞান রপ্ত করত, তাহকীকের ধারেকাছে যেত না। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম কুরআন, হাদীস ও ফিকহের অর্থ, মর্ম উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেখবর ছিল।' (আল খাইরুল কাসীর; পৃষ্ঠা ৩৪)

এই অবক্ষয় ও অধঃপতনের যুগে মুসলিম বিশ্ব এমন এক মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) এর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছিল, যে শিরক বিদ'আতের সয়লাবের গতিরোধ করে দিবে, শিয়াদের অপতৎপরতা রুখে দিবে, ভণ্ড পীর-ফকীরদের মুখোশ উন্মোচন করবে, কুরআন-হাদীস ও ফিকহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অর্থ-মর্ম, ভেদ-রহস্য মুসলিমদের হাতে তুলে দিয়ে মুসলমানদেরকে ইসলামের মূলধারায় ফিরিয়ে আনবে।

শাহ সাহেবের জন্ম : আল্লাহ তা'আলা ভারতবর্ষের মুসলিমদের উপর বিশেষ রহমত নাযিল করলেন। তিনি ১১১৪ হিজরীর ১৪ শাওয়াল বুধবার ভারতের উত্তর প্রদেশ মুজাফফার নগরের 'ফুলাত' নামক স্থানে কাঙ্ক্ষিত সেই মহান সংস্কারককে পাঠালেন।

শাহ সাহেবের বংশ : শাহ সাহেবের বংশ পরম্পরা হযরত ফারুকে আযম উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর সাথে মিলিত হয়। তারা মূলত আরবীয় বংশোদ্ভূত। তার পিতা শায়েখ আব্দুর রহীম বিদগ্ধ আলেম ও উঁচু স্তরের ওলী ছিলেন। শামসুদ্দীন মুফতী নামক তার এক পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথম ভরতের 'রুহিতক' নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তার থেকেই এই বংশ ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। শাহ সাহেবের পূর্ব পুরুষদের তালিকা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তারা প্রায় সকলেই আলেম, বিচারক, মুফতী, মুজাহিদ ও আল্লাহওয়ালা ছিলেন। (তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত; বঙ্গানুবাদ ৫/৫২)

শিক্ষা : পাঁচ বছর বয়সে তাকে মক্তবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর তখনকার প্রচলিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন শুরু করেন। পনেরো বছর বয়সে ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাকোর্স শেষ করেন। শিক্ষা সমাপন উপলক্ষে তার পিতা শাইখ আব্দুর রহীম বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের ব্যবস্থা করেন। শাহ সাহেব অধিকাংশ কিতাবই তার পিতা শাহ আব্দুর রহীম সাহেবের কাছে পড়েছেন।

আধ্যাত্মিক দীক্ষা : শাহ সাহেব তার পিতার কাছেই আধ্যাত্ম-শিক্ষা লাভ করেন। ১৪ বছর বয়সে পিতার হাতে বাইয়াত হন। ১৭ বছর বয়সে যখন তার পিতা ইন্তিকাল করেন তখন মৃত্যুশয্যায় তিনি তাকে বাইয়াত ও ইরশাদের অনুমতি দেন।

বিবাহ : ১৪ বছর বয়সে তার পিতা মামা শাইখ উবাইদুল্লাহ সিদ্দীকীর কন্যার সাথে তার বিবাহ পড়িয়ে দেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি সাইয়েদ সানাউল্লাহ সোনাপতীর কন্যা বিবি ইরাদতকে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভেই তার সুযোগ্য চার পুত্র শাহ আব্দুল আযীয, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ আব্দুল কাদির ও শাহ আব্দুল গনী রহ. জন্মগ্রহণ করেন।

হজ্জ ও সফরে ইলমী : শাহ সাহেব ১১৪৩ হিজরীর যিলকদ মাসে হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় পৌঁছেন। যিলহজ্জ মাসে তিনি হজ্জ পালন করেন। এরপর ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জনে মনোনিবেশ করেন। হারামাইন শরীফাইনে তিনি এক বছরাধিক কাল কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি যেসব উস্তাদ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন তারা হলেন, ১. শাইখ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল কুর্দী মাদানী, শাফেয়ী। ২. শাইখ আব্দুল্লাহ মালেকী, মক্কী। ৩. শাইখ তাজুদ্দীন হানাফী মুফতীয়ে মক্কা। ৪. শাইখ মুহাম্মদ আফযাল শিয়ালকোটী প্রমুখ। হজ্জের সফর থেকে দেশে ফিরে তিনি পাঠদান ও সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

শাহ্ সাহেবের সংস্কারমূলক কার্যক্রম : শাহ সাহেবের যামানার মুসলিম সমাজের করুণ চিত্র ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তখনকার মুসলিম জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কারমূলক বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হল-

আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত : শাহ সাহেব অনুধাবন করলেন যে, মূলত কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরত্বের কারণেই মুসলিমরা আকীদাগত অধঃপতনের শিকার হয়েছে। তিনি ভেবে দেখলেন, আকীদা সংরক্ষণ ও সংশোধন এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কুরআনে কারীমের হেদায়াত ও শিক্ষাকে সরাসরি প্রচার-প্রসার করার চেয়ে ফলপ্রসূ কোনো পথ-পন্থা হতে পারে না। তাই *ফাতহুর রহমান* নামে তখনকার সর্বজনবোধ্য ফার্সী ভাষায় খুবই সহজ সরল ভঙ্গিতে কুরআনের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

জ্ঞানী মহলে কুরআনের চিন্তা গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টি এবং কুরআনের দ্বারা উম্মতের সংশোধনের ক্ষেত্রে শাহ সাহেবের আরেকটি বৈপ্লবিক খেদমত হল *আল ফাওযুল কাবীর*। কিতাবটি সম্পর্কে আল্লামা আলী নদভী রহ. বলেছেন, 'আমাদের জানা মতে বিষয়বস্তুর বিচারে গোটা ইসলামী গ্রন্থাগারে এটি একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থনা'। (তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত; বঙ্গানুবাদ ৫/১০৬)

শাহ সাহেব *আল আকীদাতুল হাসানাহ* নামে ইলমে কালাম তথা তাওহীদ-আকাইদ এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার সারনির্যাস উল্লেখ করেছেন।

হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার : বরাবরই ভারতবর্ষে ইলমে হাদীস অনাদর ও নির্দয়তার শিকার হয়েছে। বলতে গেলে হিজরী দশম শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের পঠন-পাঠন শূন্যের কোঠায় ছিল। উলামায়ে কেরাম ইউনানী দর্শন, গণিত ও ফিকহের ভাসাভাসা জ্ঞান অর্জনকেই যথেষ্ট মনে করত। অনেকে বরকতস্বরূপ *মিশকাত শরীফ* বা *মাসাবীহুস সুন্নাহ* পড়ে নিত। হিজরী দশম শতকের শেষার্ধে বড় বড় বেশ কয়েকজন মুহাদ্দিসীনে কেরামের ভারতে শুভাগমন ঘটে। যেমন শাইখ আব্দুল মুতী (মৃত ৯৮৯) শাইখ শিহাব আহমাদ মিসরী (মৃত ৯৯২) শাইখ মুহাম্মদ ফাকেহী (মৃত ৯৯২) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ। মূলত এসব মুহাদ্দিসীনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উত্তর ভারতে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু করান।

এরপর হিজরী এগার শতকের মাঝামাঝি শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (মৃত ১০৫২) রাজধানী দিল্লীতে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেন। তার ইন্তিকালের পর তার সুযোগ্য সন্তানগণ নিজেদের সাধ্যানুযায়ী খেদমতের এই ধারাকে সচল রাখেন। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হাদীসের প্রতি সেই গণজোয়ার, আগ্রহ-উদ্যম, উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি যার আশা করা হয়েছিল। ফলে হিজরী বারো শতক ভারতবর্ষের শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্র এমন এক ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী ছিল যিনি মুহাব্বতের সাথে ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারকে নিজ জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য স্থির করবেন। ভারত সেই ব্যক্তিত্বকে পেয়েছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর সত্তারূপে। তিনি হাদীসের দরস-তাদরীস, প্রচার-প্রসার এবং হাদীসের ওপর গবেষণামূলক লিখনীর মাধ্যমে এমন বিশাল সংস্কারমূলক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তার অন্যান্য দীনী খেদমতকে ছাপিয়ে 'মুহাদ্দিসে দেহলবী' তার নামের অংশে পরিণত হয়েছে।

শাহ সাহেব *মুআত্তা*কে কুতুবে সিত্তার প্রথম স্তরে রাখতেন। তিনি *মুআত্তা*কে বিশেষভাবে সমীহ করতেন। *মুআত্তার* উপর দু'টি ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন, (১) *মুছফ্ফা* (ফার্সী), (২) *মুসাওয়া* (আরবী)। এই ভাষ্যগ্রন্থ দু'টির মাধ্যমে ইলমে হাদীসের উপর শাহ সাহেবের পাণ্ডিত্য, বুৎপত্তি ও মুজতাহিদসুলভ ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

তাছাড়া তিনি ফিকহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি কট্টরপন্থী ফকীহ (যারা ভুল প্রমাণিত হওয়ার পরও মাযহাব থেকে চুল পরিমাণ সরে আসতে প্রস্তুত নন) এবং আসহাবে যাহেরকে (যারা মূলত ফিকহকে অস্বীকার করে) অপছন্দ করতেন। তিনি তার ওয়াসিয়ত নামায় লিখেন, 'শাখা মাসআলায় এমন মুহাদ্দিস উলামায়ে কেরামকে অনুসরণ করা উচিত, যিনি ফিকহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রে সমান অভিজ্ঞ আলেম। ফিকহী মাসআলাগুলোকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিয়ে নেয়া কর্তব্য'।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা : শাহ সাহেবের যামানায় যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রের বেশ প্রভাব ছিল। মুসলমানদেরকে বেহুদা ইউনানী ফালসাফা থেকে বিরত রাখার জন্য যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রের আঙ্গিকে ইসলামী শরীয়তের মজবুত ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এবং হাদীসের তত্ত্ব-মর্মের পর্দা উন্মোচন করতঃ আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* রচনা করলেন। এভাবে *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা* সেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের যুগে এক নতুন ইলমে কালাম হয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে হকপন্থী সুস্থ মনের মানুষের জন্য চিন্তা, প্রশান্তি ও স্বস্তির পর্যাপ্ত খোরাক।

শিয়াদের অপতৎপরতা রোধ : শিয়াদের অপতৎপরতা রোধের উদ্দেশ্যে তিনি *ইযালাতুল খফা আন খিলাফাতিল খুলাফা* রচনা করেন। এটি শাহ সাহেবের আরেকটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের সত্যতা কুরআন-হাদীসের দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন এবং অত্যন্ত ইনসাফের সাথে শিয়া-সুন্নী বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন। শিয়াদের অপতৎপরতা রোধে তিনি আরো একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। হযরত আবু বকর রাযি. এবং উমর রাযি. এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করে 'কুর্‌রাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিশ শাইখাইন' রচনা করেছেন।

শাহ সাহেবের 'কালামী' ও ফিকহী মাযহাবের তাহকীক : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শাহ সাহেব ফিকহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেন। কুরআন হাদীসের দলীল ছাড়া শুধু ফিকহের উপর তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। শাহ সাহেবের এই মনোভাবকে পুঁজি করে এক শ্রেণীর লোক বলে বেড়ায়, তিনি লা-মাযহাবী ছিলেন, তিনি কোনো মাযহাব মানতেন না; সরাসরি হাদীসের উপর আমল করতেন। তাদের এই প্রোপাগাণ্ডার ব্যাপারে কিছু না বললেই নয়। এ ব্যাপারে আমরা *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*'র বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ *রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ*'র ভূমিকায় দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদার্‌রিসীন মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. এর মন্তব্যের সারনির্যাস তুলে ধরাই শ্রেয় মনে করছি। তিনি লিখেছেন,

'ইলমে কালাম তথা আকীদার ব্যাপারে আহলে হকের তিনটি মাযহাব রয়েছে। (ক) আকীদার ক্ষেত্রে যারা শাইখ আবুল হাসান আশআরী (মৃত ৩২৪) রহ. এর অনুসারী তাদেরকে আশআরী বলা হয়।

(২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোজাপথ ও বাঁকাপথ

মুফতী সাঈদ আহমদ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পূর্বের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে, পরকালের মুক্তি বাঁকাপথ পরিহার করে সোজাপথে চলার উপর নির্ভরশীল। আর সোজাপথ হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ। যে পথে সাহাবায়ে কেরাম জীবন পরিচালনা করেছেন। সাহাবীগণ নববী-আদর্শে চলে প্রত্যেকেই পরবর্তীদের জন্য রাহবার ও দিশারী হয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টিই করেছেন পরবর্তীদের জন্য নববী আদর্শের নমুনা হওয়ার জন্য। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে সাহাবীগণের বহু প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ...

অর্থ : তারা যদি তোমাদের ন্যায় ঈমান আনে তাহলে নিশ্চয় হিদায়াত পেয়ে যাবে। (সূরা বাকারা- ১৩৭)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ...

অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের যারা অগ্রবর্তী ও অগ্রণী এবং পরবর্তীদের মধ্যে যারা তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ...। (সূরা তাওবা- ১০০)

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. অর্থ : আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে সুপথ পেয়ে যাবে। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী; হা.নং ১৭৬০)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, (অর্থ) যে অনুসরণ করতে চায় সে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অনুসরণ করে। কেননা তাঁরা হলেন, এ উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র আত্মার অধিকারী, গভীর ইলমের অধিকারী, লৌকিকতায় স্বল্প, সুপথ প্রাপ্ত ও উত্তম অবস্থা সম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ রাসূলের সঙ্গ ও দীন কায়েমের জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাদের মর্যাদা অনুধাবন কর। তদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কেননা তারা সকলেই সুপথপ্রাপ্ত। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী; হা.নং ১৮১০)

মোটকথা, সাহাবীগণের সকলেই ছিলেন আলোক-বর্তিকা। তবে তাদের পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত রাহবারীর দায়িত্ব আলেমগণ পালন করবেন এবং আলেমগণের নেতৃত্বে থাকবেন ফুকাহা অর্থাৎ ফিকাহবিদগণ। সাহাবীদের যামানায়ও ফকীহগণ ছিলেন অন্যদের জন্য অনুসরণীয়। হযরত আলী রাযি. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমরা এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই, সে বিষয়ে আমাদের করণীয় কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, (সেক্ষেত্রে তোমাদের করণীয় হল,) 'ফুকাহায়ে আবেদীন' আমলদার ফিকাহবিদগণের পরামর্শ গ্রহণ করবে। ব্যক্তিগত মতানুসারে আমল করবে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ৮৩৪)

উল্লেখ্য, ফকীহ একবচন, ফুকাহা বহুবচন। শব্দটি তাফাক্কুহ থেকে নির্গত। অর্থ শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ। যিনি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস তথা শরীয়তের উৎসসমূহ থেকে বিশদভাবে শরয়ী বিধান নির্ণয় করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শয়তানের বিপক্ষে একজন ফকীহ এক হাজার আবিদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৮১)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. এর বর্ণনামতে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের মাঝে শতাধিক সাহাবী ফকীহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তার অনবদ্য গ্রন্থ *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন*-এ ফকীহ সাহাবীগণের তালিকাও উল্লেখ করেছেন। (শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী কৃত উসূলে ইফতা দ্রষ্টব্য)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী সময়ের ফুকাহাদের কথাও বলে গেছেন। যেমন, হযরত মুআবিয়া রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (অর্থ) আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের তাফাক্কুহ দান করেন। আমি বণ্টনকারী আর দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এ দলটি সর্বদা আল্লাহর দীনের উপর অবিচল থাকবে। কিয়ামত অবধি কারো বিরোধিতা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১)

সহীহ বুখারীর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীসটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে আলেম ও ফকীহগণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী)

অর্থাৎ তাফাক্কুহ ফিদ্ দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে হাদীসটি সম্পূর্ণ 'সরীহ' (স্পষ্ট)। যদিও কোন কোন হাদীস বিশারদ এর দ্বারা আহলুল ইলম (আলেমগণ) আসহাবুল হাদীস বা আহলুল হাদীসও উদ্দেশ্য বলেছেন। কিন্তু সব অর্থের সারবত্তা যে দীনের পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীগণ সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.। তিনি বলেন,

ونحن لانعنى باهل الحديث المقتصرين على سماعه اوكتابته اوروايته بل نعنى بهم كل من كان احق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا.

অর্থ : আহলুল হাদীস দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য ঐ গোষ্ঠী নয় যারা শুধু হাদীস শোনে, লেখে ও বর্ণনা করে। বরং আমাদের উদ্দেশ্য ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যারা হাদীস মুখস্থ ও চেনার যোগ্যতা রাখে, হাদীসের সনদ ও মর্ম বোঝে এবং হাদীসের মর্ম ও অর্থ অনুযায়ী আমল করে। (তায়েফায়ে মানসূরাহ; পৃষ্ঠা ৩৮)

বলা বাহুল্য, এ সকল যোগ্যতা যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে হযরত আলী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'ফুকাহায়ে আবেদীন' ইবাদত-গোযার ফুকাহা বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

সূরায়ে নিসার ৫৯ আয়াতে আল্লাহ, রাসূল ও উলুল আমরের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. সাহাবা ও তাবেঈদের বরাতে লিখেন, 'এখানে উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য اهل الفقه والدين 'আহলুল ফিকহি ওয়াদ দীন' তথা ফিকহ ও দীন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ফুকাহাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শতাধিক ফকীহ সাহাবীর উল্লেখ করেছেন, তেমনি সাহাবীগণের পরে তাবেঈদের যুগের বিশিষ্ট ফকীহগণের তালিকাও নিজ কিতাব *ই'লামুল মুআক্কিয়ীন* এ উল্লেখ

করেছেন। (উসূলুল ইফতা; শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী)

তবে সাহাবা ও তাবেঈদের যুগে অন্যান্য দীনী ইলমের মত ইলমে ফিকহ স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেনি। ইলমে ফিকহ শাস্ত্রীয় আকার ধারণ করে আকাবিরে তাবেঈদের যুগে। এ সময়ে যে সকল ক্ষণজন্মা মহা মনীষী শরয়ী মাসাইলকে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে সংকলন করেন এবং পরবর্তীদের জন্য মাসাইল নির্ণয়ের নীতিমালা তৈরী করে দেন তাদেরকে বলা হয় আইম্মায়ে মুজতাহিদীন।

সে যুগে এ ধরনের মুজতাহিদ অনেক ছিলেন বটে তবে আল্লাহ তা'আলা যাদের এ মহান কীর্তি পূর্ণাঙ্গরূপে শতাব্দির পর শতাব্দী বহাল রেখেছেন, যাদের নীতিমালা পরবর্তী ফকীহগণ অনুসরণ করেছেন তাদেরকে এ উম্মত 'আইম্মায়ে আরবাআহ' তথা চার ইমাম হিসেবে স্মরণ করে থাকে। আর তাদের প্রণীত নীতিমালা ও তাদের সংকলিত মাসাইল ও আহকামকে 'চার মাযহাব' তথা চার পদ্ধতি আখ্যায়িত করে। নীতিমালা প্রণয়নে ও মাসাইলে তাদের মাঝে ক্ষেত্র বিশেষে যে মতানৈক্য হয়েছে তা সবই ছিল কুরআন-হাদীস নির্ভর এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল নির্ভর। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস কিংবা সাহাবায়ে কেরামের আমলের সমর্থন ছাড়া নিছক ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কোন ইমাম কোন মাসআলা বা বিধান রচনা করেননি। করেছেন বলে এমন কোন দৃষ্টান্ত তাদের কারো রচনায় ও সংকলনে দেখানো সম্ভব নয়। যার কারণে ক্ষেত্র বিশেষে পারস্পরিক মতানৈক্য সত্ত্বেও চার মাযহাবের সবগুলোই সঠিক। তাদের মতানৈক্য সাহাবীদের আমলের বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে পূর্ব থেকেই তা অনুমোদিত। এর সব ক'টিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র অন্তর্ভুক্ত। তাদের সকলেই সোজাপথের দিশারী। সমকালে ও পরবর্তীকালের উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের প্রায় সকলেই চার মাযহাবের কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

যথা, কাযী আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, যুফার ইবনুল হুযাইল, আবূ জা'ফর তহাবী, ইমাম শাফেয়ী রহ এর উস্তাদ ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ, হাদীস শাস্ত্রের প্রবাদ-পুরুষ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, বুখারী রহ. এর উস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, সনদ বিশ্লেষণশাস্ত্রের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের মত জগদ্বিখ্যাত আলেমগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আর ইমাম ইবনে আব্দিল বার, আল্লামা ইবনে রুশদ, ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন, ইমাম কুরতুবী, ফখরুদ্দীন রাযী ও ইবনে দাকীকুল ঈদ প্রমুখ মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা খাত্তাবী, যাহাবী, সুয়ূতী, বগভী, নববী, গাযালী, ইবনে কাসীর, ইবনে হাজার, ইবনে সালাহ, ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ প্রমুখ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম বুখারীও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী, শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী, ইবনে কুদামা, ইবনে রজব, ইমাম আবূ দাউদ প্রমুখ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস নওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেবের ভাষ্যমতে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম রহ. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

এখানে কিছু পরিচিত নাম শুধু নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হল। সর্বসাধারণের বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া ইলমে দীনের ইতিহাসে বিশেষ অবদানের কারণে যারাই যে নামে স্বীকৃত হয়েছেন তারা কে কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা নিয়ে স্বতন্ত্র কিতাবও রচিত হয়েছে যে গুলোকে 'তাবাকাত' বলা হয়। তাবাকাত সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা সকলেই জানেন যে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগ থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য উলামাদের কেউ বর্তমান যামানার গাইরে মুকাল্লিদদের মত লাগামছাড়া গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন না। এমনকি সিহাহ সিত্তার ইমামগণ এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যাদের কিতাব বগলে নিয়ে লা মাযহাবীরা মাযহাবের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়ায় তারাও মৌলনীতিতে গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন না। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার নিম্নের বক্তব্যটি এ বাস্তবতাকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে তোলে। তিনি বলেন, وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين.
অর্থ : কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈদের মতামত সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. অন্যদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২০/২২৯)

উল্লেখ্য, সাহাবা ও তাবেঈন পরবর্তী যুগে ফুকাহায়ে উম্মত চার মাযহাবে বিন্যস্ত হলেও ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন এদের সকলের পুরোধা।

ফিকহের শাস্ত্রীয় রূপদানের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ. (৮০ হি. - ১৫০ হি.) ছিলেন অন্য সকল ইমামদের পথিকৃৎ।

ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অবস্থান

ইমাম যাহাবী রহ., *তাযকিরাতুল হুফ্ফায* গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে অন্য ইমামদের উক্তি উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, (ক) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইমাম মালেক রহ. শ্রেষ্ঠ ফকীহ, নাকি ইমাম আবূ হানীফা? জবাবে ইবনুল মুবারক বললেন, ইমাম আবূ হানীফা। (খ) ইমাম বুখারীর উস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. সমকালের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। (গ) হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান বলেন, ইমাম আবূ হানীফা'র সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আমরা শুনিনি। আমরা তার অধিকাংশ কথা গ্রহণ করেছি। (ঘ) ইমাম মুযানী সূত্রে বর্ণিত, ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, ফিকহের ক্ষেত্রে সব মানুষ ইমাম আবূ হানীফার পরিবারভুক্ত। (ইমাম যাহাবী কৃত মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা দ্রষ্টব্য)

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর জন্মভূমি ছিল কূফা নগরী। হযরত উমর রাযি. এ নগরীর গোড়াপত্তন করেন। তার নির্দেশনায় এখানে ফুকাহায়ে সাহাবার এক বিরাট জামাআত বসবাস শুরু করেন। তাদের পদচারণায় অল্পদিনেই এ নগরী ইলম ও ফিকহের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। ইমাম আজালী রহ. কূফায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সাহাবীদের সংখ্যা ১৫০০ বলেছেন। যাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হযরত আবূ মূসা আশআরী, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান, হযরত সালমান ফারেসী, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীগণ শামিল ছিলেন। এ বিরাট সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে কূফা নগরীর ইলমী অবস্থা কী দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। যার ফলে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. যখন কূফাকে দারুল খিলাফত হিসেবে

নির্ধারণ করতে আসলেন তখন কূফার ইলমী অবস্থা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, رحم الله ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما. অর্থ : ইবনে মাসউদ রাযি. এর প্রতি আল্লাহর রহমত হোক তিনি এ অঞ্চলকে ইলম দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর বললেন, اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامة অর্থ : ইবনে মাসউদের শিষ্যরা এ উম্মতের প্রদীপ। বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আনাস ইবনে সীরীন রহ. বলেন, اتيت الكوفة فوجدت بها اربعة الاف يطلبون الحديث واربع مأة قد فقهوا. অর্থ : আমি কূফায় এসে দেখতে পেলাম চার হাজার ছাত্র ইলমে হাদীস অর্জন করছে আর চারশত জন ফিকহ অর্জন করে নিয়েছে। (আল্লামা যাহিদ আল কাউসারী কৃত ফিকহু আহলিল ইরাকি ওয়া হাদীসুহুম ও শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী কৃত দরসে তিরমিযীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

মোটকথা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈদের যুগে কূফা নগরী ছিল ইলমে হাদীস ও ফিকহের কেন্দ্রভূমি। চার দিকেই ছিল ইলমের জয়জয়কার। এ কারণেই সহীহ বুখারীতে যাদের সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে তিনশত জনই ছিলেন কূফার অধিবাসী। (প্রাগুক্ত)

ইমাম আবূ হানীফা রহ. খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা, তীক্ষ্ণ মেধা ও নিরলস অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কূফা নগরীর সমকালীন সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সকল মনীষীর ইলম একত্র করে নিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ খতীবে বাগদাদী হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এর উক্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর সকল ইলম আলকামা, আসওয়াদ, হারিস, আমর ও উবাইদা ইবনে কায়েসের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। আর এ পাঁচ ব্যক্তির ইলম ইবরাহীম নাখয়ী ও আমের শা'বীর মধ্যে পুঞ্জিভূত হয়েছে। আর এ দু'জনই ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ। এছাড়াও কাতাদাহ, তাউস, ইকরিমা, হাসান বসরী, আমর ইবনে দীনার, সুলাইমান আল-আ'মাশ প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর উস্তাদ ছিলেন। যার ফলে ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ. অন্যান্য ইমামদেরও ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। (প্রাগুক্ত)

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন রহ. বলেন, ومقامه فى الفقه لايلحق شهد له بذلك اهل جلدته وخصوصا مالك والشافعى. অর্থ : ফিকহের ক্ষেত্রে তার অবস্থান এত উঁচু ছিল যে, তার নাগালে পৌঁছা অন্যদের জন্য অসম্ভব। এ মর্মে তার সমকালীন আলেমরাই সাক্ষী। বিশেষ করে ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ.। (মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন)

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.

ফিকহ শাস্ত্রের ন্যায় হাদীস শাস্ত্রেও ইমাম আবূ হানীফা রহ. অন্যদের ইমাম ছিলেন। নিম্নে হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হল।

(ক) ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট উস্তাদ মাক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন, كان اعلم اهل زمانه. অর্থ : ইমাম আবূ হানীফা সমকালের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। (তাহযীবুত তাহযীব)

(খ) ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, ان ابا حنيفة كان اماما. অর্থ : নিশ্চয়ই আবূ হানীফা ইমাম ছিলেন। (তাযকিরাতুল হুফফায)

(গ) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ. বলেন, ادركت الفا من الشيوخ وكتبت منهم فما وجدت افقه ولااعلم من خمسة اولهم ابوحنيفة.

অর্থ : আমি এক হাজার শিক্ষক পেয়েছি। তাদের থেকে হাদীস লিখেছি। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে অধিক ফকীহ, অধিক মুত্তাকী ও অধিক আলেম পেয়েছি। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম। (তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৬৯)

(ঘ) ইমাম শাফেয়ী রহ. এর প্রসিদ্ধ উস্তাদ ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে নয়শত হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। (দরসে তিরমিযী; ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

(ঙ) অধিকাংশ হাদীস সংকলক ফিকহী মাসাইলের সূচী অনুযায়ী কিতাব সংকলন করেছেন। পরিভাষায় সেগুলোকে সুনান কিংবা মুসান্নাফ বলা হয়। ইমাম সুয়ূতী রহ. এর বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা রহ. কর্তৃক প্রণীত হাদীস গ্রন্থ *কিতাবুল আসার* হল এ জাতীয় গ্রন্থের সর্বপ্রথম। (তাবয়ীযুস সহীফা; পৃষ্ঠা ১১৬)

মাসাইল সংকলনে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নীতি

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর তত্ত্বাবধানে যে সকল মাসআলা সংকলিত হয়েছে তা তার ব্যক্তিগত গবেষণার সমষ্টি নয়; বরং মাসাইল সংকলনের জন্য তিনি তৎকালীন কূফা নগরীর সেরা আলেমদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেছিলেন। ইমাম তৃহাবী রহ. আসাদ ইবনে ফুরাত রহ. এর সূত্রে সে বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৪০জন উল্লেখ করেছেন। এই বোর্ড কর্তৃক সংকলিত মাসাইল শামসুল আইম্মা কারদারী রহ. এর বর্ণনা মতে ছয় লাখের অধিক ছিল। ইমাম সাহেবের একান্ত ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ রহ. কর্তৃক রচিত যে সকল কিতাব আজ দুনিয়া ব্যাপী বিদ্যমান সেগুলো মূলত ঐ সকল মাসাইলেরই পরবর্তী সংস্করণ। (আল্লামা শিবলী নু'মানী কৃত সীরাতুন নু'মান দ্রষ্টব্য)

হানাফী মাসাইল ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ব্যক্তিগত মতামত নয়; বরং কূফা নগরীর তৎকালীন সেরা আলেমদের সমন্বিত মতামত। বিষয়টি প্রমাণিত হয় ইমাম তিরমিযী রহ. এর সুনানে তিরমিযীর বর্ণনা পদ্ধতিতেও। তিনি যেখানে ইখতিলাফী মাসাইল বর্ণনার ক্ষেত্রে قال الامام الشافعى قال الامام المالك قال الامام احمد অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী এমন বলেছেন, ইমাম মালেক এমন বলেছেন, ইমাম আহমদ এমন বলেছেন মর্মে উল্লেখ করেন সেক্ষেত্রে হানাফী মত উল্লেখ করেন قال اهل الكوفة অর্থাৎ কূফাবাসী এমন বলেছেন এই ভঙ্গিতে। 'ইমাম আবূ হানীফা এমন বলেছেন' এভাবে তিনি উল্লেখ করেন না।

মোটকথা, সাহাবা ও আকাবিরে তাবেঈদের পরবর্তী সময়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ তথা মুক্তিযোগ্য দলের পথনির্দেশের কাজ যে সকল আলেম ও ফকীহ করেছেন তাদের নেতৃত্ব ছিল আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, বিশেষ করে আইম্মায়ে আরবাআ অর্থাৎ চার মাযহাবের ইমামদের হাতে। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন এদের সবার সেরা। যে কারণে উম্মতে মুহাম্মদী তাকে ইমামে আযম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে স্মরণ করে। হাফেযে হাদীস আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ রহ. বলেন, من احب ابا حنيفة فهو سنى ومن ابغضه فهو مبتدع. অর্থ : যে আবূ হানীফাকে ভালোবাসে সে সুন্নী। আর যে বিদ্বেষ পোষণ করে সে বিদ'আতী। (ইমাম ইবনে হাজার হাইসামী কৃত আল-খাইরাতুল হিসান; পৃষ্ঠা ৪৮)

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ বিশর হাফী রহ. হতে বর্ণিত, ইমাম আল-খুরাইবী রহ. বলেন, অজ্ঞ ও হিংসুক ছাড়া আর কেউ ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা করে না। অনুরূপ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফস ইবনে গিয়াস রহ. বলেন, আবূ হানীফা রহ. এর কথা চুলের চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম, মূর্খরাই

কেবল তার দোষ ধরে। (ইমাম যাহাবী কৃত মানাকিবুল ইমাম)

উল্লেখ্য, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সমালোচনা করা যে মূর্খতা নিম্নের কথাগুলো থেকেও তা প্রমাণিত। তারা বলে থাকে, ইমাম সাহেব (ক) হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন, (খ) তিনি নিজে কোন কিতাব লিখেননি, (গ) সিহাহ সিত্তায় ইমাম সাহেবের সূত্রে কোন রেওয়ায়েত নেই, (ঘ) কোন কোন ইমামুল হাদীস ইমাম সাহেবকে দুর্বল বলেছেন ইত্যাদি। অথচ পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেও ফিকহী সূচী অনুযায়ী সর্বপ্রথম হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন। তার শিষ্যদের মধ্যে ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট উস্তাদগণও রয়েছেন। তাছাড়া সিহাহ সিত্তায় তো ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সূত্রেও কোন রেওয়ায়েত নেই। ইমাম আহমদ যিনি হাদীসের জাহাজ বলে খ্যাত ইমাম বুখারীর উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও বুখারীতে তার সূত্রে মাত্র তিনটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক রহ. এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েত সংখ্যাও হাতে গোনা। আর যে সকল মুহাদ্দিস ইমাম সাহেবকে যঈফ বলেছেন মর্মে বলা হয় তা কিছু বানোয়াট বর্ণনা কিংবা অজ্ঞতা প্রসূত সমালোচনা। প্রমাণের জন্য শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী কৃত *দরসে তিরমিযী*র ভূমিকা দ্রষ্টব্য। এরপরও যারা ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. কে বাঁকা চোখে দেখে এবং অভদ্রের মতো শুধু আবূ হানীফা বলে নাম উচ্চারণ করে। তারা আসলে বাঁকাপথের অনুসারী। পরবর্তী আলোচনাসমূহে এদের মুখোশ উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। (চলবে)

নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া। খতীব, জাপান গার্ডেন সিটি জামে মসজিদ।

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

ওয়াকফ ও থামার স্থানগুলোর পরোয়া করে না। অথচ এর ফলে কখনও অর্থই বিগড়ে যায়! বড় বড় প্রতিষ্ঠান, প্রসিদ্ধ মাদরাসা কিন্তু তাসহীহে কুরআনে প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই।

(দুই) তা'যীমে কুরআনে কারীম। তিলাওয়াত শেষে কুরআনে কারীম পরিষ্কার গিলাফে আবৃত রাখ। পরিচ্ছন্ন রেহালে রেখে তিলাওয়াত কর। তেপায়ার উপর সরাসরি না রেখে পবিত্র পরিচ্ছন্ন তোয়ালের উপর রাখো। কুরআনের কোথাও যেন ছেঁড়া-ফাটা না থাকে, গিলাফ ধূলোমলিন না থাকে।

একবার আমার শাইখ হযরত হারদুই রহ. ঢাকার প্রসিদ্ধ এক মাদরাসা সফর করেন। সেখানে গিয়ে কুরআন রাখা তাকের প্রতি তাকালেন। কাছে গিয়ে কুরআনের ওপর হাত রাখলেন। হাত ধূলায় ভরে গেল। সাথে সাথে দু' তিন জন দৌড়ে আসলেন। তার হাত মুছে পরিষ্কার করতে চাইলেন। হযরত রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'আমার হাত দামী না আমার আল্লাহর কুরআন দামী, আমার হাত সাফ করতে এসেছো, অথচ আল্লাহর কুরআন ধূলায় ছেয়ে আছে! কতোদিন কতো বৎসর পার হলো অথচ তা সাফ করতে পারলে না?!' এ হলো কুরআনের প্রতি আমাদের তা'যীমের অবস্থা। তাকে কুরআন রাখা হয়েছে। না গিলাফ আছে, না ঢেকে রাখার পরিচ্ছন্ন পর্দা আছে। আল্লাহর কালাম যেখানে এতো অবহেলায়, সে প্রতিষ্ঠানে বরকত আসবে কোত্থেকে! মাদরাসার অভাব দূর হবে কিভাবে? উস্তাদদের প্রয়োজন পূরণ হবে কোথা থেকে?

মোটকথা, কুরআনের তা'যীম করতে হবে। হিফযুল কুরআন, মকতব বিভাগের ছাত্রদের সুন্দর আরামের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের থাকার জায়গা প্রতিষ্ঠানের অন্য সব জায়গার চেয়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন করতে হবে। আমার শাইখ হারদুই রহ. বলতেন, 'সুন্দর দামী কার্পেট আগে হিফয, মকতব বিভাগে বিছাও তারপর দাওরায়ে হাদীসের চিন্তা কর।' অথচ আমরা সম্পূর্ণ উল্টো করি। হিফয-মকতব বিভাগের ছাত্ররা ছোট-মা'সুম ওরা কষ্ট বরদাশত করতে পারে না। তারা সবেমাত্র মায়ের কোল ছেড়ে এসেছে। এতোদিন তারা মায়ের মহব্বতের ছায়ায় ছিল। তাই তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা কর্তব্য।

(তিন) তাকরীমে হামেলীনে কুরআন। কুরআনের যারা খেদমত করে তাদেরকে যথাযথ সম্মান করা। অবহেলা কিংবা ভিন্ন চোখে না দেখা। এরা হিফয কিংবা মকতবের শিক্ষক, এরা কী জানে?! এভাবে চিন্তা করা অন্যায়। আমার শাইখ তাদেরকে ইজ্জত করে شيخ القران (শাইখুল কুরআন) বলতেন। আর অন্যদেরকে বলতেন شيخ المنطق شيخ الادب। কিংবা অন্য কিছু। খেয়াল করা উচিত, আমরা যারা কিতাব বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক তারা মকতব, হিফয বিভাগের শিক্ষকদের কোন নযরে দেখি। এসব শিক্ষকদের ওযীফাও তো অনেক কম নির্ধারণ করা হয়। ওযীফার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পূর্বে এমন ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমাদের শাইখের ওসীলায় আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে হিফয-মকতব বিভাগের উস্তাদগণের ওযীফা প্রথম পর্যায়ে কিতাব বিভাগের সমস্কেল নির্ধারণ করে থাকি। যার দরুণ আল্লাহর রহমতে রাহমানিয়ায় আমরা এর বরকতও উপভোগ করছি। এখানে ছয় কোটি টাকার জমি ক্রয় করা হয়েছে। ১২ কাঠার ওপর ছয় তলা মসজিদের কাজ চলছে। মাদরাসার দশ তলা ভবন নির্মাণের পাইলিং শুরু হয়ে গেছে। কোন ফান্ড নেই, টাকা নেই। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ভালোভাবে কাজ চলে যাচ্ছে। টাকার জন্য কাজ কখনও বন্ধ থাকেনি। এটা হলো থানবী রহ. এর সেই নিয়মাবলী পালনের বরকত। তাছাড়া আমরা সপ্তাহে অন্তত একবার সমস্ত আসাতিযায়ে কেরাম মাদরাসার যাবতীয় প্রয়োজন ও সামগ্রিক বিষয়াবলী নিয়ে পরস্পরে মশওয়ারা করে সমাধানের চেষ্টা করে থাকি। যাদের এসব উসূল জানা নেই তারা থানবী রহ. রচিত *আল-ইলমু ওয়াল উলামা* কিতাবটি সংগ্রহে রাখবে, নিয়মিত মুতালা'আ করবে এবং মাদরাসার সাপ্তাহিক মশওয়ারায় ১০ মিনিট হলেও তা থেকে পড়ে শোনাবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ আর্থিক বা অন্য কোন ধরনের অভাব অনটন থাকবে না এবং অতি অবশ্যই মাদরাসার সার্বিক উন্নতি ও তারাক্কী হবে ইনশাআল্লাহ। হযরত থানবী রহ. বলেন, যে প্রতিষ্ঠানে এই তিনটি কাজ (১) সহীহ তা'লীম, (২) তা'যীমে কুরআন ও (৩) তাকরীমে হামেলীনে কুরআন যথাযথভাবে পালন করা হবে আল্লাহর রহমতে তাদের কোন ধরনের অভাব থাকবে না। এসব উসূল পালনের বরকতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব অভাব দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তার সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করে সার্বক্ষণিক ও তাৎক্ষণিক দায়িত্বগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

অনুলিখন, মাওলানা আব্দুল হান্নান শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

আলোক মিনারে

কেমন আছেন হযরত পাহাড়পুরী হুযূর

মাওলানা আবরারুয্যামান

পুরনো কথা

সাধারণের মুখে শোনা একটি কথা যখন কোন আল্লাহওয়ালার যবানে উচ্চারিত হয় কথাটার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য তৈরি হয়। মনে হয় যেন কথাটা আজই প্রথম শোনা হল। এক হল কথার শব্দ। আরেক হল কথার রূহ। আল্লাহওয়ালা যারা তারা কথার রূহটা ধারণ করেন। তাদের যবানে কথার মূল শক্তিটাই প্রতিভাত হয়। শব্দের অন্তরালে তারা মূলত রূহটাকেই পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। তাদের কথা হয় সাদামাটা। কিন্তু কথার মধ্যে থাকে প্রবল তাসীর; প্রচণ্ড জীবনীশক্তি। আল্লাওয়ালাদের দরবারের একটা সাধারণ চিত্র হল, এখানে যা কিছু বলা হয় সব পুরনো কথা। কিন্তু এখানে থাকে রূহ ও আত্মার খোরাক। এখানে এক কথাই বারবার বলা হয়। বলনেওয়ালা এ কথা চিন্তা করেন না, এক কথা কত বলবো। নিষ্ঠাবান শ্রোতাও এ ভেবে বিরক্ত হয় না, এক কথা কতবার শোনবো।

পাহাড়পুরী হুযূর

পাহাড়পুরী হুযূর দা.বা.। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান। এ দেশের আলেম সমাজের মধ্যমণি। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সর্বমহলে সমাদৃত একটি নাম। সুদীর্ঘ আঠারো বছর হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর সুহবতে রিয়াযাত মুজাহাদার পর আল্লাহ তা'আলার ইশক মুহাব্বাতের অনন্য উচ্চতায় আরোহনকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘদিন যাবত নানাবিধ রোগে জর্জরিত। ডায়বেটিসের বয়স সাতাশ বছর। ব্রেইন স্ট্রোক তিনবার। সাত বছর আগে প্রথমবার। বছর না পেরোতেই আরো একবার। এর কিছুদিন পর তৃতীয়বার। কমতে শুরু হল চোখের জ্যোতি। শুরু হল চোখে কম দেখা। দিনে দিনে অবনতি। পরীক্ষা নিরীক্ষা হল। ধরা পড়ল ভয়াবহ রোগ– গ্লুকোমা। যার আরেক নাম চোখের মৃত্যু। ডান চোখ সম্পূর্ণ অকেজো। বাম চোখের বেশির ভাগ আক্রান্ত। সবর, তাওয়াক্কুল ও ইনাবাত ইলাল্লাহর প্রতিমূর্তি আমার আব্বাজান দা.বা.। তবু স্থির অনড় ও অবিচল থাকলেন। বিধ্বস্ত দেহটাকে নিয়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চালিয়ে গেলেন দরস তাদরীসের খেদমত। মনের গভীরে আজীবন লালিত স্বপ্ন আল মারকাযুল ইলমীর কাজে দৌড়ঝাঁপ অব্যাহত রাখলেন। এভাবেই চলল অনেক দিন। কুদরতের ফায়সালা, একদিন আব্বাজান অনুভব করলেন, পায়ে ও হাঁটুতে জোর নেই। দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছেন না। বহু কষ্টে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু হাঁটতে পারছেন না। আল্লাহর প্রিয় বান্দা বুঝে ফেললেন, মুনিব এখন গোলামকে অন্য কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। হঠাৎ করেই থেমে গেল জীবনের গতিময় পদচারণা। শুরু হল এক অন্য অভিযাত্রা। অভিন্ন লক্ষ্যে শুরু হল ভিন্ন পথে পথচলা। লোকসমাগম ও মানুষের ভীড়ই ছিল এতকাল যার কাজের মূল ক্ষেত্র, তারই সমগ্র অস্তিত্বজুড়ে এখন একাকিত্বের নির্মল আবেশ। সমাগম এখন তাকে পীড়া দেয়। নিবিড় নীরবতায় তিনি এখন জীবনের পরম আস্বাদ খুঁজে পান। তার যারা আপনজন এবং অতি কাছের তাদের সামনে তিনি অকপটেই প্রকাশ করেন তার এ অনুভূতি। যারা দূরের কিংবা তার অনুভব অনুভূতির সাথে পরিচিত নন, তাদের সামনে তাঁকে সংকুচিত দেখা যায়। তাদের মনে না কোন কষ্ট চলে আসে এ ভয়ে নিজের তবিয়তকে বড় বেশি নির্দয়ভাবেই চাপা দিয়ে রাখেন। নীরবতা ও একাকিত্বে যেখানেই বিঘ্ন ঘটে তিনি অসহনীয় কষ্টে পতিত হন। জীবনভর ঘরের বাইরে মানুষের সমাগমে দ্বীনের মহান খেদমত আঞ্জাম দেয়া এ মানুষটি একপ্রকার মজবুর হয়েই ঘরের ভিতরের জীবনকে এখতিয়ার করে নেন।

নিভৃত কক্ষে

আশ্রাফাবাদ কামরাঙ্গীরচরে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে নূরিয়া (পরিবর্তিত নাম জামিয়া নূরিয়া)। মাদরাসার পূর্ব সীমানাসংলগ্ন মদীনা মসজিদের গলি। গলির উত্তর প্রান্তে তিনতলা বাড়ী। তৃতীয় তলার পূর্ব দিকের একটি কামরায় তিনি থাকেন। চোখে গ্লুকোমায় সূর্যের আলো ও উত্তাপ কোনটাই সহ্য হয় না। দিনের বেলা ঘরের প্রশস্ত জানালাগুলো তাই বন্ধ রাখতে হয়। কাচের জানালা। আলো তবু চলে আসে। কাচের উপর কালো কাগজ লাগিয়ে আলো প্রতিরোধের ব্যবস্থা, তবু ফাঁক-ফোকর গলে কিছু আলো চলে আসে। সেটাও কষ্টকর। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে জানালা ঢেকে তৈরি হল দেয়াল আলমারি। অপর জানালা বরাবর দাঁড় করানো হল স্টিলের আলমারি। ঘরে আলো বাতাস আসার আর কোন ব্যবস্থা নেই। আবদ্ধ পরিবেশ। এর মধ্যেই চোখে, দেমাগে দেহে ও সর্বাঙ্গে রোগ ও শোকের অসহ্য জ্বালা নিয়ে বসবাস করেন সবর ও ধৈর্যের পাহাড় আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দা.বা.। প্রিয় মুরশিদ হাফেজ্জী হুযূর রহ. যেখানে শুয়ে আছেন তার সন্নিকটে আশরাফাবাদের এ বাড়ীতে নিভৃত এ কক্ষে কেমন কাটছে পাহাড়পুরী হুযূরের দিনকাল– জানতে চান তার অসংখ্য ছাত্র ভক্ত ও অনুরাগী। সুলুসুল লাইলিল আখির-রাতের শেষ প্রহরে আব্বাজানের চোখ খুলে যায়। কখনো আরো আগে। কখনো রাতভর সজাগ থাকেন। রাত কেটে যায় নামাযে ও যিকিরে। একাকী নীরবে নিভৃত কক্ষে কত কথাই চলে মাহবুবে হাকীকির সাথে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আব্বাকে দেখার জন্য তার কামরায় যাই। দেখি আব্বা হয়ত সেজদায় পড়ে আছেন। নয়ত যিকিরে মশগুল। এভাবেই রাত ভোর হয়। দূরের ও কাছের মসজিদগুলো থেকে একে একে ভেসে আসতে থাকে আযানের ধ্বনি। নিস্তব্ধ চরাচরে আযানের ধ্বনিপুঞ্জ হৃদয়ের গহীনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। জায়নামাযে বসে মাথাটাকে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে তিনি শুনতে থাকেন আযান। বিড়বিড় করে জবাব দেন আযানের। অদূরেই নূরিয়ার মাইক থেকেও আসে আযান। পয়ত্রিশ বছরের পুরনো আযান। কারী আবুল হুসাইনের আযান। পনেরো বছর যখন তার বয়স, হাফেজ্জী হুযূর তাকে নিয়োগ দিলেন নূরিয়ার মুয়াযযিন হিসেবে। সেই থেকে আবুল হুসাইন এখনো আযান দিয়ে চলেছেন। আবুল হুসাইনের আযান ভেসে আসে আব্বার কানে। আব্বা নিজেকে হারিয়ে ফেলেন পয়ত্রিশ বছর আগের সাজানো একটি বাগানে। যে বাগানের মালী ছিলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.। হাফেজ্জী হুযূরের স্নেহধন্য কারী আবুল হুসাইনের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠের আযান আব্বাকে বড় বেশি তন্ময় করে তোলে। হয়তো মনে পড়ে হাফেজ্জী হুযূরের কথা। সেই সময়ের নূরিয়ার কথা। সেইসব নূরানী ও সমুজ্জ্বল দিনের কথা। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

মুলাকাত

ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করেন। নামাযের পর ব্যক্তিগত আমলের পর উপস্থিত লোকদের আমল আখলাকের খোঁজখবর নেন। জরুরী দিকনির্দেশনা দেন। গুরুত্বপূর্ণ কোন কিতাব থেকে কিছু অংশ পড়া হয়। তাফসীর হাদীস কিংবা আকাবিরদের মাওয়ায়েজ থেকে কিছু কিছু পড়া হয়। এ সময়টা আব্বা নসীহত ও উপদেশ পেশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্যও সময়টা উপযোগী। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন ফজরের পরপরই সাক্ষাতের জন্য চলে আসে। অনেকে ফজরের আগেও রওয়ানা দিয়ে দেয়। ফযরের পর এশরাকের আগে এ সময়টাতে আব্বাজান ছোট ছোট কথায় দ্বীনি ও দুনিয়াবী বড় বড় মুশকিলাতের হল পেশ করে থাকেন। অনেকে স্বপ্নের তাবীর জানতে চান। আব্বাজান তাদেরকে স্বপ্নের তাবীর বলে দেন। কখনো শুধু তাবীর বলেন; কখনও কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ তাবীর পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা আব্বাকে তাবীরের আজীব যোগ্যতা দান করেছেন। লেখা দীর্ঘ হয়ে যাবে, নয়ত মনে চাচ্ছিল এখানে আব্বাজানের বিশেষ এ ইলমের কিছু নমুনা পেশ করি।

সাক্ষাত ও নাস্তা সেরে সাড়ে দশটা পর্যন্ত বিশ্রাম। রাতের ঘুমের ঘাটতি পূরণের প্রচেষ্টা। বিশ্রাম শেষে চাশতের নামায। তারপর বারোটা পর্যন্ত আমরা যারা কাছে থাকি ডেকে দীনি কিতাবাদি পড়তে বলেন। আমরা ছেলেরা উপস্থিত না থাকলে আব্বাজান তার মেয়েদের কাউকে ডাকেন। তারাই তখন আব্বাকে কিতাব পড়ে শোনায়। বারোটা পর্যন্ত চলে এ আমল। বারোটার পর উযূ বা গোসল সেরে প্রথমে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল উযূ তারপর চার রাকাত ফাইয়ে যাওয়াল (দ্বি-প্রহরের নামায) আদায় করেন। যোহর নামাযের পর 'সূরা ফাতহ' তেলাওয়াত শোনেন। আসর পর্যন্ত কিছুক্ষণ বিশ্রাম; রাতের ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি। আছরের পর সূরা নাবা তেলাওয়াত শোনেন। এরপর সাক্ষাতপ্রার্থীদেরকে সময় দেন। বাদ মাগরিব কমছেকম ছয় রাকাত আওয়াবীন আদায় করেন। এরপর এশা পর্যন্ত ব্যাক্তিগত আমলে ব্যস্ত থাকেন। এশার পর দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর একটা বিশেষ নসীহতের উপর আমল করেন। হাফেজ্জী হুযূর রহ. বলতেন, তোমার যদি তাহাজ্জুদের সময় উঠতে কষ্ট হয় তবুও তুমি তাহাজ্জুদ ছাড়বে না। এশার দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদার পর চার রাকাত নফল পড়ে নিবে। শেষ রাতে যদি উঠতে নাও পারো ইনশাআল্লাহ এ চার রাকাতই তোমার তাহাজ্জুদের কায়েম মাকাম (স্থলবর্তী) হয়ে যাবে। আব্বাজান এশার দুই রাকাত সুন্নাতের পর এ আমলটা নিয়মিত করে থাকেন। এরপর রাতে তাহাজ্জুদের নামায তো আদায় করেনই।

পরামর্শ

আব্বাজানকে আল্লাহ তা'আলা যেসব বাস্তবমুখী যোগ্যতা দান করেছেন এর মধ্যে অন্যতম হল, সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ দান। জীবনভর আব্বা অসংখ্য মানুষের এ খেদমত করেছেন। ব্যক্তিগত পারিবারিক এমনকি বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শও দিতেন। আল্লাহর রহমতে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অগণিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আব্বাজানের পরামর্শে পরিচালিত হয়ে আসছে। অদ্ভুত রকম পেরেশানীতে পড়ে মানুষ আব্বার কাছে আসত, আব্বা তাদেরকে দু'চার কথায় এমন এমন কিছু পরামর্শ দিয়ে দিতেন যে, তারা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচত। আমি মনে করি পরামর্শ দানের এ যোগ্যতা আমার আব্বাজানের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এখনো এতটা শারীরিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আব্বা যেভাবে সুচিন্তিত ও দূরদর্শী দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাতে স্পষ্ট মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা আব্বাজানকে একজন প্রকৃত দিকনির্দেশক হিসেবেই যেন দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

ইসলাহ

ইসলাহে নফসের কি কোন মানসুস তরিকা আছে? আত্মার সংশোধনের জন্য সুনির্ধারিত কোন পদ্ধতি কি ইসলাম বাতলে দিয়েছে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ যিন্দেগী মুতালাআ করে জানা যায়, একেকজনের ইসলাহ নবীজী একেকভাবে করেছেন। أي الأعمال أحب إلى الله؟ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ প্রশ্নের জবাব নবীজী একেকজনকে একেকভাবে দিয়েছেন। কাউকে বলেছেন, জিহাদ। কাউকে বলেছেন, নামায। কখনো কলেছেন, ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে খরচ করা। কখনো, মা বাবার খেদমত। নবীজির এ সুন্নাতের প্রভাব নবীর ওয়ারিসদের মধ্যে তো পড়বেই। আমি আমার আব্বাজানকে দেখেছি, তার ইসলাহে নফসের পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র। একটা সময় পর্যন্ত আব্বা সরাসরি ভুল ধরতেন কম। কিন্তু এমন কিছু কাইফিয়্যাত ও হালাত তৈরি করতেন, বলার চেয়েও যার ক্ষমতা হত অনেক বেশি। যার গভীরতা, প্রগাঢ়তা, ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব হত বিস্ময়কর। এখন আব্বার তরিকায়ে ইসলাহের মধ্যে এ পরিবর্তনটা আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করছি,আব্বা এখন বলার শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন। যবানের মাধ্যমকে পুরোপুরি ব্যবহার করছেন। একেকসময় একেকটা মাধ্যম মানুষের জন্য উপকারী হয়। উম্মতের যিম্মাদাররা বিষয়টা ভালমতই বোঝেন। হুদায়বিয়ায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ যবানের ভাষা ব্যবহার করলেন। তারপর উম্মতের জন্য উপকারী ভেবে উম্মুল মুমিনীনের এ পরামর্শকে সাদরে কবুল করে নিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুখে বলার বদলে আপনি আমলের ভাষায় নির্দেশ জারি করুন।'

আব্বাজানের যিন্দেগীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ ছায়া পড়েছিল। একটি ভুলের জন্য কাউকে খুব শাসিয়েছেন। আবার একই ভুল কারো মধ্যে বহুদিন দেখছেন কিন্তু কিছুই বলছেন না। একই ভুল, একটা সময় পর্যন্ত যার ইসলাহ এক পদ্ধতিতে করছেন। ঐ ভুলটারই সংশোধন পরে ভিন্ন পন্থায় করেছেন।

শিরোণামটাই কেবল লেখা হল। এ শিরোণামের অধীনে আব্বাজানের যিন্দেগীর বিশাল বিস্তৃত যে অধ্যায়, তার কিছুই বলা হল না। কখনো যদি সুযোগ হয় ইনশাআল্লাহ বিষয়টাকে নিয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে আছে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন।

তাদরীস

আব্বাজানের তাদরীসী যিন্দেগীর বয়স চল্লিশ বছর। সুদীর্ঘ এ সময়ে আব্বাজানের দরসদানের যে বৈশিষ্ট্যের কথা শোনেছি এবং শেষমেষ কিছুটা দেখারও সুযোগ পেয়েছি, আব্বা কখনো সবক নাগা দিতেন না। সবকে সময়মত হাজির হতেন। যেখানেই থাকতেন, যত জরুরী ব্যস্ততাই থাকত, সবকের সময় ঠিকই উপস্থিত হয়ে যেতেন। নূরিয়া মাদরাসায় যখন পড়াতেন আব্বার যিম্মায় ছিল একদিকে বুখারী শরীফ। অপরদিকে উর্দূ কায়েদা। প্রথম কিতাব এবং শেষ কিতাব একসঙ্গে দুই কিতাব

পড়াতেন। আব্বার সবকের এক বৈশিষ্ট্য ছিল, আব্বার ছাত্ররা যেমনই হোক, মেধাবী মেধাহীন সবাই তার সবক সমানভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। জামাতের সবচেয়ে স্বল্প মেধার অধিকারী যে ছাত্রটা, আব্বা তাকে নিশানা বানিয়ে সবক বোঝাতেন। ফলে সমস্ত ছাত্র সবক বুঝে যেত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ইত্তেবা করে গুরুত্বপূর্ণ কথা কমছেকম তিনবার করে বলতেন। ফলে দরসেই ছাত্রদের পড়া মুখস্ত হয়ে যেত। ইবতেদায়ী আউয়াল থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত সমস্ত সবক আব্বা একই ঢংয়ে পড়াতেন। সবকে কোনদিন তাড়াহুড়া করেননি। সারা বছর প্রতিদিন একই নিয়মে পড়িয়ে গেছেন। বছর শেষে দেখা যেত, আব্বার নেসাব বড় ইতমিনানের সাথে শেষ হয়ে গেছে। তাদরীসী যিন্দেগীর শুরু মাদরাসায়ে নূরিয়ায়। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর সরাসরি নেগরানীতে। দীর্ঘ একুশ বছর নূরিয়া মাদরাসায় তাদরীসসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো যিম্মাদারি পালন করেন। হযরত হাফেজ্জী হুযূরের ইন্তেকালের কয়েক বছর পর আব্বাকে নূরিয়া ছেড়ে চলে আসতে হয়। সে এক 'অন্য' ইতিহাস। নূরিয়া থেকে এসে মিরপুর মুসলিম বাজার এমদাদিয়া মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। সেখান থেকে চলে আসেন মুহাম্মদপুর জামিয়া মুহাম্মদিয়ায়। সেখানে দীর্ঘ দিন বুখারী শরীফের দরস প্রদান করেন। সেখান থেকে বড় কাটারা আশরাফুল উলূম মাদরাসা। সেখান থেকে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর। সেখান থেকে সর্বশেষ জামেয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া।

নূরিয়া কায়েদা

পড়াতেন বুখারী শরীফ; চিন্তা করতেন মক্তবের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। পড়াতেন দাওরায়ে হাদীসের বুখারী; ভাবতেন মক্তবের কায়েদা নিয়ে। হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর চিন্তা ছিল, শিশুদের জন্য এমন একটা নেসাব তৈরি হওয়া দরকার যার সাহায্যে শিশুরা এক বছরেই কুরআন শরীফ ত্রিশ পারা নাযরানা পড়ে ফেলতে পারে। শুরু হল ফিকির ও মেহনত। আব্বাজান ভাবতে থাকলেন, কী করে বাস্তবায়ন করা যায় এ মিশন। তখনকার প্রচলিত সমস্ত কায়েদা সামনে রাখলেন। খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করলেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর তৈরি হল নূরিয়া কায়েদা। কায়েদাটাকে তৈরি করা হয়েছে শুধুই কুরআনের শব্দ দিয়ে। আজিব এক উসলূবে কায়েদাকে সাজালেন আব্বাজান। বাচ্চারা পড়া শুরু করল এ কায়েদা। দেখা গেল অল্প সময়ের মধ্যেই কায়েদা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কায়েদা শেষ হতে হতে কুরআনের বহু শব্দের সাথে শিশুর পরিচয় হয়ে যাচ্ছে। এরপর শিশুটা যখন কুরআন হাতে নিল, দেখা গেল সহজেই সে কুরআন পড়ে ফেলতে পারছে। এ কায়েদার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর উদ্ভাবিত মাত্র এক বছরের এ নেসাব অল্প সময়ের ব্যবধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। এ নেসাবের প্রধান স্তম্ভ আব্বাজানের তৈরি করা এ কায়েদাটা এতদিন যাবত আব্বা নিজেই ছাপাতেন। এখন আব্বাজানের অসুস্থতার পর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বড় ভাই মাওলানা আশরাফুজ্জামানের কাঁধে।

এক বর্গহাত জমিন এবং তিনশত তেরো টাকা

হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর মিশন ছিল বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে কমছেকম একটি করে কুরআনী মকতব কায়েম করা। শিশুরা যাতে কচি বয়সেই সীনার মধ্যে কুরআনকে ধারণ করে ফেলতে পারে। আব্বা আপন যিন্দেগী ওয়াকফ করলেন এ মিশন বাস্তবয়নের জন্য। শুরু হল মকতব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। একজন শিক্ষক নিয়ে হাজির হলেন কোন গ্রামে। গ্রামবাসীকে বললেন, আপনাদের কাচারী ঘরে আমাদের একটু জায়গা দিন। আমরা এখানে আপনাদের বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষা দেবো। এজন্য আমাদের পয়সা দিতে হবে না। আপনাদের বাচ্চাদের জন্য এই শিক্ষককে রেখে যাবো। সহজ প্রস্তাবে গ্রামবাসী রাজী হয়ে গেল। শুরু হল বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষাদান। কিছুদিন যাওয়ার পর গ্রামবাসী নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মক্তবের জন্য একটি ঘর করে দিল। উস্তাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিল। ব্যস, একটা মকতব কায়েম হয়ে গেল। এভাবে তৈরি হয়ে গেল বেশ কিছু মকতব। কিন্তু গ্রামে গ্রামে মকতব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হাজার হাজার উস্তাযের। উস্তায-প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজন স্থায়ী কেন্দ্রের। দরকার নিজস্ব জায়গার। প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ টাকার। কোথায় পাবেন আব্বা এত টাকা। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে আব্বার একটাই চিন্তা, কিভাবে যোগাড় হবে এত টাকা? দোয়া চলতে থাকল। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি চলতে থাকল। আব্বা তখন জামিয়া মুহাম্মদিয়ায়। একদিন কোন এক নামাযের উযূ করছেন। উযূর মধ্যেও মাথায় একটাই চিন্তা। কিভাবে যোগাড় হবে এত টাকা। একথা ভাবছেন আর উযূ করছেন। চেহারা ধোয়া হয়ে গেল। এবার হাত ধোবেন। ডান হাত ধোয়া শুরু করেছেন। হঠাৎ আব্বার চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কেউ দেখল না চেহারার সে পরিবর্তন। আল্লাহ তা'আলা দেখলেন। ডান হাত ধোয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা আব্বার মাথায় ঢেলে দিলেন, এক বর্গহাতের চিন্তা। আব্বা ভাবলেন, বিস্তৃত জায়গার চিন্তা না করে আমি একবর্গহাতের চিন্তা করি না কেন? এক বর্গহাত জায়গা করেই যোগাড় করি না কেন? এক বর্গহাত জায়গার দাম কত? জরুরী মশওয়ারা ডাকা হল আলু বাজার মিফতাহুল উলূম মাদরাসার দফতরে। তার আগে ঠিক করা হল কোন জায়গাটা কেনা হবে। জায়গা ঠিক হল। জায়গার মোট মূল্যও নির্ধারণ করা হল। তারপর মিফতাহুল উলূম মাদরাসার প্রবীণ মুরুব্বী মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবকে আব্বা বললেন, এক শতকের দাম যদি এই হয় তাহলে প্রতি বর্গহাতের দাম কত হয়? ফজলুর রহমান সাহেব গভীর মনোযোগে হিসাব বের করার চেষ্টা করছেন। সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অকেক্ষণ হিসাব-নিকাশের পর তিনি জানালেন, হুযূর, এক বর্গহাতের দাম হয় তিনশত তেরো টাকা। সবার যবান থেকে একসাথে বের হল, আল্লাহু আকবার। সবগুলো চোখ ছলছল করে উঠল। কারো আর বুঝতে বাকি রইল না, যা হচ্ছে সব গায়েবের ইশারায় গায়েবের সরাসরি নেগরানীতেই হচ্ছে। এরপরের ইতিহাস অনেক লম্বা।

আল মারকাযুল ইলমী বাংলাদেশ

এক বর্গহাতের 'হাত ধরে' এবং তিনশ তেরোর গায়েবী ইশারাকে সম্বল করে প্রতিষ্ঠিত হল আল মারকাযুল ইলমী বাংলাদেশ। আল মারকাযুল ইলমী বাংলাদেশ আব্বাজানের প্রতিষ্ঠিত একটি এলহামী প্রতিষ্ঠান। আব্বাজান তার জীবনটাকেই নিংড়ে দিলেন এ প্রতিষ্ঠানের পিছনে। তিনশ তেরো, তিনশ তেরো করে টাকা উঠিয়ে আব্বা কিনে ফেললেন ঊননব্বই শতক জায়গা। আলমারকাযুল ইলমীর কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে, মুআল্লিম প্রশিক্ষণ। আব্বাজানের স্বপ্ন এবং প্রচেষ্টা ছিল এখানে সারা বছর মুআল্লিম প্রশিক্ষণ হবে। একেকটি প্রশিক্ষণ এক

মাসব্যাপী। যাতে বছরের যেকোন সময় এখানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। মসজিদ তৈরি হল। প্রশিক্ষণের জন্য ঘর তৈরি হল। সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। এখনই শুরু হবে ব্যাপক আকারে কার্যক্রম। কুদরতের কী ইশারা, তখনই আব্বাজান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর এ কাজের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হল বড় ভাই মাওলানা আশরাফুজ্জামানের কাঁধে। বড় ভাইজান বড় সার্থকতার সাথে যোগ্য উত্তরসূরী হয়েই আব্বাজানের এ গুরু দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন।

হাফেজ্জী হুযূর

দীর্ঘ সফর শেষে আব্বা দেশে ফিরছেন। বিমানবন্দরে আব্বাকে এসতেকবালের জন্য যিনি এসেছেন তিনি আর কেউ নন; স্বয়ং হাফেজ্জী হুযূর। আব্বাকে বুকে জড়ালেন এবং বললেন, 'আজ আমার রূহ ফিরে এসেছে'।

নূরিয়ার দক্ষিণে পুকুরের ঘাটলায় হাফেজ্জী হুযূর বসে আছেন। আব্বাকে ডেকে পাঠালেন, 'আজকে শুধু আপনাকে একটা কথা বলার জন্যই আমি এখানে এসেছি। আমি শোনেছি, কেউ কেউ নাকি নূরিয়া ছেড়ে চলে যাবে। শোনেন মৌলভী আব্দুল হাই, যার ইচ্ছা থাকবে, যার ইচ্ছা চলে যাবে। আমার কোন পরওয়া নাই। আপনি নূরিয়া ছেড়ে যাবেন না। আপনাকে যদি এক দরজা দিয়ে বের করে দেয় আপনি অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন'।

একবার হাফেজ্জী হুযূর আব্বাকে বললেন, 'আমার মনে চায়, আমি আপনাকে মক্কা ও মদীনায় ত্রিশ পারা বুখারী শরীফ পড়াই'। আব্বাজান পবিত্র বাইতুল্লাহকে সামনে নিয়ে অতঃপর নবীজির রওযার সামনে বসে হযরত হাফেজ্জী রহ. এর কাছে ত্রিশ পারা বুখারী পড়ার বিরল গৌরব অর্জন করেন।

হাফেজ্জী হুযূর রহ. কে মুরুব্বী বানিয়ে চলতে হবে- আব্বার কাছ থেকে এ ওয়াদা নিয়ে দাদাজান আব্বাকে ঢাকায় পড়াশোনার অনুমতি দিয়েছিলেন। দাদাজানের ইচ্ছা ছিল আব্বা হাটহাজারী পড়বে। আব্বাজান হাফেজ্জী হুযূরকে মুরুববী বানিয়ে ভর্তি হলেন লালবাগ মাদরাসায়। হাফেজ্জী হুযূর রহ. মৃত্যু পর্যন্ত আব্বাকে ছায়া দিয়ে গেছেন। হাফেজ্জী চলে গেছেন। হাফেজ্জীর স্মৃতিকে সম্বল করে আব্বা এখনো বেঁচে আছেন।

তলাবুল ইলম

শিক্ষাজীবনের শুরু পাহাড়পুর ইমদাদুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসায়। জালালাইন পর্যন্ত পড়ে ঢাকা লালবাগ মাদরাসায় ভর্তি হলেন। মিশকাত দাওরা লালবাগে সমাপন করে এক বছর নূরিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর পাকিস্তানের খাইরুল মাদারিসে এক বছর ফুনুনাত পড়েন। পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে নূরিয়া মাদরাসায় পুনরায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

স্বপ্ন

হৃদয়ে স্বপ্ন লালন করেন, মদীনায় হবে তার কবর। নিয়মিতই দোয়া করেন, اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك আল্লাহ তার এ স্বপ্নকে আপনি পূরণ করুন। সাথে তার আওলাদ ও পরবর্তীদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

লেখক, সাহেবযাদা, পাহাড়পুরী হুযূর দা.বা.

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

ফিকহী মাসআলায় যেহেতু শাইখ আবুল হাসান রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাই সাধারণত শাফেয়ীগণ আশআরী হয়ে থাকেন। (খ) এক্ষেত্রে যারা শাইখ আবু মনসূর মাতুরীদী (মৃত ৩৩৩) রহ. এর অনুসারী তাদেরকে মাতুরীদী বলা হয়। শাইখ আবু মনসূর ফিকহের ক্ষেত্রে যেহেতু হানাফী ছিলেন, তাই সাধারণত হানাফীগণ মাতুরীদী হয়ে থাকেন। এই দুই শাইখের মধ্যে ইলমুল আকাইদের মাত্র বারোটি শাখাগত মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে। (উলামায়ে কেরাম বলেন, এ মতবিরোধ মূলত বর্ণনা ভঙ্গির পার্থক্যের মতবিরোধ, মৌলিকভাবে তাদের মাঝে কোন মতভেদ নেই)। (গ) ঐ সমস্ত মুহাদ্দিসীনের মাযহাব যারা আল্লাহ তা'আলার সিফাতের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া পছন্দ করেন না। এই মতের অনুসারীদেরকে সালাফিয়্যাহ বলা হত। (বর্তমান সালাফী আর এই সালাফী এক নয়)।

শাহ সাহেব আকীদাগতভাবে আশআরী ছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে আবুল হাসান আশআরী রহ. এর মতের অনুসারী ছিলেন। তবে মুহাদ্দিসীনদের মাযহাবকেও পছন্দ করতেন।

আর ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করতেন। এটা শুধু দাবী নয়; স্বয়ং শাহ সাহেব এ কথা নিজ হাতে বুখারী শরীফের ঐ কপিটির উপর লিখেছেন, যা তিনি নিজের কাছে রাখতেন এবং সংরক্ষণ করতেন। বুখারী শরীফের সে কপিটি এখনও ভারতের খোদাবখশ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

বুখারীর উক্ত কপির উপর শাহ সাহেব নিজ হাতে নিজ নামের সাথে নিম্নোক্ত শব্দগুলি লিখেছেন,

العمرى نسبا الدهلوى وطنا الاشعرى عقيدة الصوفى طريقة الحنفى عملا والحنفى والشافعى تدريسا...

অর্থ : বংশে উমরী, দিল্লীর অধিবাসী, আকীদায় আশআরী, তরীকায় সূফী, আমলে হানাফী, পঠন-পাঠনে হানাফী ও শাফেয়ী...।

শাহ সাহেবের নিজ হাতের লেখা দ্বারাই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ফিকহে হানাফীর অনুসারী ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল পঠন-পাঠনে হানাফী ও শাফেয়ী এ কথার অর্থ কি?

এ কথার অর্থ হলো, তিনি দরস-তাদরীসের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের পাবন্দী করতেন না যে, সকল ক্ষেত্রেই হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিবেন। বরং দলীলের আলোকে যে মাযহাব প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য মনে করতেন সবক পড়ানোর সময় তিনি সে মাযহাবকেই প্রাধান্য দিতেন। এ হিসাবে কখনও হানাফী আবার কখনও শাফেয়ী মাযহাবকে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু যখন আমল করার সময় আসত তখন তিনি হানাফী মাযহাব অনুসারেই আমল করতেন।

শাহ শাহেব নিজেই বলেছেন, কোনও মাযহাব হক হওয়ার দুটি অর্থ, (১) মাযহাবটি কুরআন হাদীসের সরাসরি বাণীর মুয়াফেক হওয়া, (২) কুরআন-হাদীসের মর্ম ও উদ্দেশ্যের মুয়াফেক হওয়া।

অতএব, কোনো ক্ষেত্রে যদি তিনি শাফেয়ী মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাহলে তা দিয়েছেন প্রথম অর্থের ভিত্তিতে, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে সেই মাসআলায়ও হানাফী মাযহাব বিশুদ্ধ।

মোটকথা, শাহ সাহেব হানাফী, শাফেয়ী বা মালেকী যাই হোন না কেন তিনি কস্মিনকালেও গায়রে মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী ছিলেন না। কারণ লা-মাযহাবিয়্যাতের ভিত্তিই হল ইজমা ও কিয়াস অস্বীকারের উপর। অথচ শাহ সাহেব *ইকদুল জীদ* এবং *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*'র প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ইজমা ও কিয়াসের প্রামাণ্যতা সাব্যস্ত করেছেন।' (বিস্তারিত দেখুন, রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ ১/৪৭-৫২)

ইন্তেকাল : দীনের বহুমুখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ষাট বছর বয়সে **১১৭৬** হিজরীর মুহাররমের শেষ দিন তিনি এই নশ্বর ধরা ত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতে যাত্রা করেন। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন এবং তার মাকাম ও মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিন। আমীন॥

লেখক, দারুল ইফতার সহকারী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-২

সততা একটি মহৎ গুণ। বিশেষ করে সরকারী চাকুরিজীবিদের কেউ সৎ হলে বুঝতে হবে তিনি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার সাথে যদি হন দীনদার তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তেমনি একজন স্বর্ণমানব, শিক্ষায় ডক্টর এবং পদবিতে প্লানিং কমিশনে জয়েন্ট সেক্রেটারী। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। স্নেহের আতিশয্যে বাবা বলে ডাকতেন। তার এ বাবা ডাকার পেছনে ছিল এক করুণ অভিব্যক্তি। আমার মতো আরও অনেককেই তিনি হয়তো বাবা ডেকেছেন। দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর উদ্দেশ্যে। ভক্তি ও শ্রদ্ধা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এর জন্য পাত্র চাই। প্রকৃত পাত্রের অভাব হলে মানবমন কৃত্রিম পাত্র তালাশ করে নেয়।

শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবনে পদার্পণ করে ড. সাহেব স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন শুরু করেছেন। সে দাম্পত্যে আল্লাহ তা‘আলা একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। বেড়ে উঠছে পুত্র সন্তান। বড় হচ্ছে দম্পতির স্বপ্ন। বিপত্তি ঘটলো কয়েক বছরের মাথায়। হঠাৎ স্ত্রী বিয়োগে ডক্টর সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এভাবে কেটে যায় বেশ ক’ বছর। তারপর যদিও ততোদিনে স্নেহের পুত্র মোটামুটি সাবলম্বী হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের ধাক্কা সামলাতে খোদ ডক্টর সাহেবের আরও অনেক বছর লেগে যায়। ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী বিয়োগের পরপরই অন্য স্ত্রী গ্রহণের প্রতি উৎসাহ থাকলেও মরহুমা স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা বিলম্বের কারণ হয়। অথচ তখন এমন ভালোবাসা মরহুমার কোনই কাজে আসে না। স্ত্রীহারা স্বামীর একাকীত্বের জীবন কতোটা কষ্টদায়ক এ উপলব্ধি মরহুমার থাকলে সেও ভালোবাসার এমন খেসারতকে সমর্থন করতো না। অনুরূপ বিষয় স্বামীহারা স্ত্রীর ক্ষেত্রেও। তবে মাতৃনির্ভর সন্তানাদী থাকলে কিছু ভিন্নতাও আছে। যাই হোক, সামাজিক ও মানসিক কারণে ডক্টর সাহেব নতুন সংসার শুরু করেছেন প্রায় বার্ধক্যে পৌঁছে। নতুন চাচী তো বিবাহে মোটে রাজিই ছিলেন না। কষ্টে কষ্টেই যৌবন শেষ করেছেন। অবশেষে বৃদ্ধ ডক্টর সাহেবের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন নিজেও আধা বৃদ্ধা হয়ে। কিন্তু কারও এখন আর সন্তানের আগ্রহ নেই। সম্ভাবনাও নেই। ইতিমধ্যে প্রথম ঘরের একমাত্র সন্তান নিজেও ঘর বেঁধে নিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকেও একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। মাস যায়, বছর যায়। পুত্রের পুত্র সন্তানও বড় হয়। কিন্তু দাদা-দাদী, মা-বাবা, কারোই স্বপ্ন বাড়ে না। বাড়ে কেবল দুঃখ আর দুঃস্বপ্ন। কারণ ছেলেটি দৈর্ঘে-প্রস্থে ও আয়তনে ঠিকই বাড়ছে। কিন্তু তিন মাস বয়সের বাচ্চার চেয়ে অধিক নড়াচড়া করতে পারে না। তিন-তিনে নয় বছর পর্যন্ত দেশের বড় বড় ডাক্তারগণ রোগ শনাক্ত করতেই ব্যর্থ হন। তখন মা-বাবা দু’জনে বাচ্চাকে নিয়ে লন্ডন চলে যায়। বৃদ্ধ যুগল দেশে থেকে যান। লন্ডনের ডাক্তারগণ গবেষণার দুষ্প্রাপ্য উপাদান হিসেবে তাকে ফ্রি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেন। এক পর্যায়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের শীর্ষস্থানীয় ডাক্তারগণকে নিয়ে বোর্ড গঠন করা হয়। টানা ছয় মাস সম্মিলিত পরীক্ষা ও গবেষণার পর তারা যে রোগ শনাক্ত করেছেন তা হল, বাচ্চার সবকিছু ঠিক আছে; শুধুমাত্র হাঁড়ের ভিতরে জন্মগতভাবে মজ্জা তৈরি হচ্ছে না। আর এ কারণেই সে উঠাবসা করতে, ডানেবামে নড়তে পারছে না। তাদের মতে চিকিৎসার ইতিহাসে এমন রোগীর দেখা তারা এই প্রথম পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এর যথাযথ চিকিৎসা মেডিক্যাল সায়েন্সে আবিষ্কৃত হয়নি। অবশেষে আরও ছয় মাস তাদের পর্যবেক্ষণে থেকে দশ বছর বয়সে বাচ্চাটি মারা যায়। এভাবে আল্লাহ তা‘আলা টেস্ট টিউব বেবী ও ক্লোনিংয়ের আবিষ্কারকদেরকে বুঝিয়ে দেন যে, সৃষ্টির সকল কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহরই; কোনও মাখলুকের নয়। অন্যথায় হাত, পা, চোখ, নাক, কান ও রক্ত-গোশত সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি দান করলেন। শুধুমাত্র হাঁড়ের ভিতরের মগজটা বাকী রাখলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় বড় পুরস্কার বিজয়ীদের জন্য। কিন্তু কেউ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারলো না। বিষয়টি বোঝার জন্য কুরআনে পাকে একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে আহ্বান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ...

অর্থ : বলতো তোমরা যে বীর্যস্খলন করো তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমিই তার স্রষ্টা? (সূরা ওয়াকিয়া- ৫৮, ৫৯) অর্থাৎ প্ল্যানিং তোমাদেরটা চলে, না আমারটাই?

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ...

অর্থ : হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন ও তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন। তিনি যেমন আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন। (সূরা ইনফিতার- ৬, ৭, ৮)

তো ডক্টর সাহেবের নাতির আর দেশে ফেরা হলো না। অপর দিকে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে তার মা-বাবাও দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিলেন। ফলে পুত্র থাকতেও পুত্রহারা হলেন বৃদ্ধ পিতা ডক্টর সাহেব। ফোনে ফোনে হাই-হ্যালোই এখন একমাত্র সান্ত্বনা।

ড. সাহেব প্রায়ই বলতেন, ‘ছেলেটা অর্থকষ্টে লন্ডনে দিন কাটাচ্ছে। অথচ আমার এখানে নিজস্ব ফ্ল্যাট। আগারগাঁওয়ে যে বাড়িভাড়া পাই তাতে

সে নিজস্ব কোন উপার্জন ছাড়াই অনেক ভালো চলতে পারতো। বউটার কারণে ছেলেটা দেশে আসে না।' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বউয়ের সমস্যা কোথায়? আসলে সমস্যা হলো জীবনযাত্রা। দেশে থাকলে রক্ষণশীল শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে হবে। পাছে স্বামী আবার অল্প বয়সে নামাযী না হয়ে যায়, তাবলীগীদের পাল্লায় পড়ে হুযূর না হয়ে যায়, বউকে আবার বোরকা কিনে না দেয়! দেশের মেয়েদের পোশাক-আশাকেও তো অনেক বাড়তি ঝামেলা!! স্বাধীনতাপ্রিয় আধুনিক বউয়ের এসব চিন্তা স্বামীকে নিয়ে ফ্রি মাইন্ডের দেশে প্রবাস জীবনে উৎসাহিত করবে এটাই স্বাভাবিক।

অপর দিকে ড. সাহেব দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। বাজার-সদাইয়ে মাঝে মধ্যে সহযোগিতার জন্য এখন আমার সহকর্মীকেও বাবা ডাকতে শুরু করেছেন। কখনও আবার সহকর্মী ছোট বাবার বিরুদ্ধে আমার কাছে নালিশও করছেন। আমি কৈফিয়ত চাইলে সে বলতো, মুরুব্বী সারাদিন খালি প্যাচাল পাড়ে। আমার এইসব প্যাচাল ভাল্লাগে না। তাছাড়া আন্টি পর্দা করে না, সামনে চলে আসে, ইত্যাদি।

মোটকথা, পেনশনের টাকা ও বাড়ি ভাড়ার টাকায় বাজার-ঘাট করা, কিছু দান করা, সময়ের আগেই মসজিদে হাযির হওয়া, কারও সর্দি-কাশি দেখলে নিজ সংগ্রহ থেকে একটু হোমিও ডোজ দেয়া, দৈনিক পত্রিকা পড়া, খবর দেখা আর আস্তে আস্তে সাড়ে তিন হাত ঘরের দিকে অগ্রসর হওয়া– এ-ই ছিল তার সে সময়ের রুটিন মাফিক কাজ। শেষ দিকে হার্নিয়া রোগে ভারাক্রান্ত হয়ে করালেন অপারেশন। যার ফলে জীবনে ভাটার টান শুরু হয় খুব জোরেশোরে। মসজিদে আসা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরে বসে বসে আশা করতেন যেন কৃত্রিম বাবারা গিয়ে কিছু সময় সঙ্গ দেয়। কিন্তু যেখানে আসল বাবাই দূর থেকে হাই-হ্যালোতে সীমাবদ্ধ, সেখানে নকল বাবাদের কাছে তো এতটুকুর ফুরসতও নেই।

৩০ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। মরহুমের জানাযা, কাফন-দাফন ইত্যাদি সেরে তিনদিন পর ঢাকায় ফিরে শুনলাম ডক্টর সাহেব ১লা জানুয়ারী ইন্তেকাল করেছেন। আগের রাতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। প্রতিবেশির সহায়তায় বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। রাত শেষে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। লন্ডন প্রবাসী ছেলেকে জানানো হলে সে দ্রুত আসার প্রস্তুতি নেয় মৃত বাবাকে এক নজর দেখার জন্য। সে আসা পর্যন্ত লাশ হিমাগারে রাখতে বলে। দু'দিন পর ছেলে আসলে ৩রা জানুয়ারী বাদ ফজর আমরা তাঁর জানাযা পড়লাম। ফজরের পর কফিনের কাছে গিয়ে দেখি মাথার কাছে জিন্সের প্যান্ট পরা ক্যাপ মাথায় এক যুবক চুপচাপ বসে আছে। হয়তো মকবুল হজ্জের সওয়াবের আশায় পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এ হজ্জে উযূ-নামায লাগে না। তাই জুতা-মোজা ও ক্যাপ দেখে মনে হলো সে উযূ-নামায কোনটাই আদায় করেনি। গ্রামে গিয়ে দ্বিতীয় জানাযা পড়বে তাই এখানে জানাযায়ও শরীক হয়নি। আর যদি গ্রামের জানাযায়ও শরীক না হয় তাতেও অসুবিধা নেই। কারণ তারা মনে করবে সে প্রথম জানাযায় শরীক ছিলো!

হিমাগারে লাশ রেখে দাফন কাজে বিলম্ব করা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের পাশাপাশি কতটা অমানবিক তা ডক্টর সাহেবের লাশ যারা দেখেছে তারা আন্দাজ করেছেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত ঈমানদারদের কাফনে মোড়ানো চেহারা কতো তরতাজা ও উজ্জ্বল দেখায়। পক্ষান্তরে হিমাগারে রাখা লাশ কেমন ফ্যাকাশে ও নীল বর্ণ হয়ে যায়। মৃতের চেহারা দেখলে মনে হয় সে যেন সকলের কাছে এ জুলুমের বিচার চায়। কিন্তু প্রবাসী সন্তানেরা জীবদ্দশায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে একাকী রেখে যে জুলুম করছে তার তুলনায় মরার পর হিমাগারে রেখে কাফন-দাফনে দেরী করানো তো অনেক তুচ্ছ ব্যাপার। শরীয়তের চাহিদা তো আগেও মানেনি। এখন মরার পর না মানলে আর কী আসে যায়! ঢাকঢোল পিটিয়ে তিনদিনা, চল্লিশা করে নিলে এ সবের কাফফারা হয়েও অতিরিক্ত থাকবে!! ডক্টর সাহেবের ছেলে সময়-স্বল্পতার কারণে শহরে ও গ্রামে তিনদিনা, কুলখানি করে চেহলামের জন্য অন্যদেরকে অসিয়ত করে সেই যে লন্ডনে চলে গেল আজ পর্যন্ত আর ফেরেনি। ফেরার দরকারও নেই। এখন ডক্টর সাহেবের বিধবা বৃদ্ধার একাকীত্বের জীবন। নিরাপত্তার ভয়ে কাজের বুয়াকে সার্বক্ষণিক বাসায় রাখতে পারছে না। কাজের বুয়া চলে গেলে ঘরটা হয়ে যায় জীবন্ত গোরস্তান। সুস্থ মানুষই যেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা সেখানে অসুস্থ বৃদ্ধার দিন কিভাবে কাটছে, বুকে যাদের অন্তর আছে তারা অনুমান করতে পারে।

কিন্তু যদি ডক্টর সাহেবের পরিবারের পরিধি এত ছোট না হতো, তার যদি চার-পাঁচটা সন্তান থাকতো কিংবা যে সন্তানটা আছে সেটা যদি দীন-ধর্ম বিমুখ না হয়ে আল্লাহ অভিমুখী ও দীনদার হতো তাহলে কি ডক্টর সাহেবের শেষ জীবনটা এত করুণ ও অসহায়ত্বের হতো? নিশ্চয় সন্তান কম হওয়া, প্রথম স্ত্রীর পরলোকে চলে যাওয়া, ছেলেটার দীনদার না হওয়া এগুলো সবই তাকদীরের ব্যাপার। ডক্টর সাহেব হয়তো অধিক সন্তানের আশাবাদী ছিলেন এবং একমাত্র পুত্রকে দীনদার বানাতে চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। আল্লাহ তাঁর পরকালকে স্বার্থক করে দিন। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর শেষ জীবনটা কল্যাণময় করে দিন। তার ঘটনা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য তাকে খাটো করা নয়; বরং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা এক বা দুয়ের অধিক সন্তান অপছন্দ করে, বিড়ম্বনা মনে করে বা সন্তান আছে কিন্তু সন্তানের দীনদারী ও পরহেজগারীর ফিকির করে না, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদীর সময় অপর পক্ষের দীনদারীর খেয়াল করে না তারা যেন ডক্টর সাহেবের শেষ জীবনের আশঙ্কায় থাকে। তাদের শেষজীবন এমন মর্মান্তিক হবে না এমন কোন আশ্বাস ও নিশ্চয়তা কি তাদের কাছে আছে? থাকলে সেগুলো যেন খুব হেফাযত করে রাখে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আবু তামীম

(৬ পৃষ্ঠার পর)

সংগত কারণেই উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানকে সত্য ও বাস্তবসম্মত আর প্রতিপক্ষের অবস্থানকে ভুল ও অসংগত প্রমাণিত করতে গলদঘর্ম হবেন। আর এভাবেই মতদ্বৈতার অন্তহীন ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত হবে কি? এটাই হবে যে, সত্য পথের রাহবারগণ নিজেরাই পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পথবিচ্যুত হবেন। এর মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। কেননা তারা তো প্রকৃত অর্থে মুসলিম উম্মাহ ও উলামায়ে কেরামের একতাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায়।

ইলমশূন্য, সুবিধাবাদী, সুখ্যাতি পাগল আলেমরা লাভবান হবেন, দীনের কোনো লাভ হবে না

এগার. একথা অনস্বীকার্য যে, টেলিভিশন, ভিডিও ইত্যাকার ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় ওয়াজ-নসীহত ও দীনের

প্রচারের সময় আত্মপ্রদর্শনের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ রয়েছে। অপর দিকে বর্তমানে দুনিয়ায় অর্থকড়ির প্রতি লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি পূজার রমরমা অবস্থা চলছে। এমতাবস্থায় যদি এ পদ্ধতিতে দীন প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে আশঙ্কা লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণে ঢের বেশি হবে। কারণ, তখন এর উপর এমন লোকদের প্রাধান্য বেশি হবে যাদের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামিতার চেয়ে নিজেদের মান-মর্যাদা ও পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যাদের অন্তরে ইসলামের দৌলত ছাপিয়ে বস্তুবাদি প্রাচুর্যের মোহ জেঁকে বসে আছে।

আজ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ফলাফল এটাই যে, যারাই ইসলামের প্রতিনিধি হওয়ার দাবীদার হয়ে টিভি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের পিঠে সওয়ার হয়েছে তাদের বক্তব্য যখন মিডিয়ার কল্যাণে জাতির সামনে এসেছে তখন তাদের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি না হয়ে বরং হ্রাস পেয়েছে। তাদের উপস্থাপনার মাঝে ইসলামের জন্য মানানসই শক্তি ও প্রজ্ঞা ফুটে উঠিনি। কারণ, এ ধরনের লোক সাধারণত গভীর ইলমের অধিকারী হন না। তারা মুখস্ত দু'কথা শিখে স্কলার নাম ধারণ করে জুড়ে বসেছেন। যারা প্রাজ্ঞ আলেমে দীন, যাদেরকে সত্যিকারার্থে দীনের মুখপাত্র বলা যায়, তারা সব সময়ই নিজেদেরকে এই ময়দান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

আমাদের ধারণা, টিভিতে দীনী প্রোগ্রাম করা জায়েয ফাতওয়া দেয়া হলে ঐ সব মহল এ থেকে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে, যারা গভীর বিস্তৃত ও ইলমশূন্য হওয়া সত্ত্বেও সুখ্যাতির পাগল। তারা এমন সব দলীল প্রমাণ মিডিয়াতে ছাড়বে এবং এমন সব ফাতওয়া প্রকাশ করবে যাতে হেদায়াত তো হবেই না উপরন্তু গোমরাহীর পালে হাওয়া দেয়া হবে। আর তখন 'তথা নিজে পথ হারা ও অন্যদেরকেও পথহারা করতে সদা ব্যস্ত' এই হাদীস দিবালোকের ন্যায় সত্য হয়ে আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। এবং তাদের সেই কাককণ্ঠের নিচে উলামায়ে হকের আওয়াজ হারিয়ে যাবে। ইসলামী মিডিয়ায় দেখা দিবে চরম নৈরাজ্য ও হতাশা। ইসলাম ও দীন প্রচারকের ইলমী ও আমলী দায়বদ্ধতা থাকা আবশ্যক। ভিডিও টিভিতে তা সম্ভব নয়।

যার ব্যক্তিগত আমল ও আকীদা সম্পর্কে জানা নেই তার থেকে ইলম অন্বেষণ করা নিরাপদ নয়

বার. প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. বলেন,

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

অর্থ : এই ইলমই হলো দীন। সুতরাং তোমরা দেখে নিবে, তা কার কাছ থেকে গ্রহণ করছো? (সহীহ মুসলিম ১/১২ শামেলা সংস্করণ)

অর্থাৎ দীন প্রচারকারীকে ইলমী বিশুদ্ধতা ও ব্যক্তিগত তাকওয়ার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। অন্যথায় তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। টিভিতে দীন প্রচারকারীর ইলমী যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত দীনদারীর প্রত্যক্ষ যাচাই বাছাই দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সুযোগে লম্পট, বদমায়েশ ও গোমরাহ চিন্তাধারার অধিকারী এমনকি ইয়াহুদ-নাসারার এজেন্টদের পক্ষেও ইসলামী জ্ঞান(!) বিতরণের সুযোগ এসে যাবে। বর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষে হচ্ছেও তাই। এই জ্ঞান পেয়ে একজন মুসলমান দর্শক নিজের অজান্তেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এমনকি ঈমানহারাও হয়ে যেতে পারে। কাজেই টিভি, ভিডিও ও ইন্টারনেটের এমন দূরবর্তী ও ব্যক্তিগত আমল-আকীদা-অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম ও উপদেশ গ্রহণ করা যাবে না।

উলামায়ে কেরামের সাদামাটা অনুষ্ঠান দর্শকপ্রিয়তা পাবে না। আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট তা চলতে দিবে না

তের. এ বিষয়ে সর্বশেষ যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হল, যদি মুসলমানগণ নিজেদের মত করে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও নোংরামী মুক্ত একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করে এবং যোগ্য ও হক্কানী উলামায়ে কেরাম সেটাকে পরিচালনা করেন, তাহলে সেটা সম্পর্কে কি বলা হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে ভূমিকাতে বলতে চাই, 'দিল্লি হনূয দূরাস্ত' এ স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে বোধ হয়। হক্কানী উলামায়ে কেরাম তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আজ পর্যন্ত সর্বজন গৃহিত একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছেন কি? অথচ পত্রিকার মাধ্যমে বাতিল কি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে না? অবশ্যই করছে। তাহলে সেই বাতিলের মোকাবেলায় প্রাণীর ছবিমুক্ত, নগ্ন বিজ্ঞাপনমুক্ত একটি সর্বজন গ্রাহ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের স্বাক্ষর উলামায়ে কেরাম আজ পর্যন্ত কেন রাখতে পারলেন না? একটি নিজস্ব ইসলামী টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে একটি নিজস্ব ইসলামী পত্রিকার প্রকাশ করা সহজ ও নিরাপদ নয় কি?

এরপর কথা হল, প্রাণীর ছবি থাকাবস্থায় কোন চ্যানেল ইসলামী হয় কি করে? তাসবীর ও ছবির ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা সবিস্তারে প্রমাণসহ এ নিবন্ধের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য যদি ছবির বিষয়টা সহ্যও করে নেই, তাহলে জিজ্ঞেস করি, উলামায়ে কেরামের এই সাদামাটা টিভি চ্যানেল সাধারণ দর্শক দেখতে পছন্দ করবেন কি? কতটুকু করবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক আসে, তবুও বলব, মেহরাব, মেম্বার থেকে খতীবগণের ঐ কথাগুলো তাদের কানের ভেতর প্রবেশ করে না কেন? মেহরাব মিম্বর থেকে তো উলামায়ে কেরামই এ কথাগুলো বলে থাকেন? বলুন, যে কথাগুলো মিম্বর থেকে বলা হলে তাদের কানে প্রবেশ করে না, সেই কথাগুলো টিভি থেকে তারা কেন শুনবেন? আসলে যারা টিভি দেখেন তারা টিভিতে এমন অনেক কিছু দেখেন, যা মিম্বর ও মেহরাবে দেখা যায় না। কাজেই যেই টিভিতে তাদের কাঙ্ক্ষিত রংচঙা দৃশ্য থাকবে না, সেই টিভি দেখার প্রয়োজনীয়তা তারা খুব একটা বোধ করবে বলে মনে হয় না।

তারপরও মেনে নিলাম ইসলাম প্রেমিক জনগণ উলামায়ে কেরামের সাদাকালো খালেস দীনী টিভি খুব করে দেখবে এবং উপভোগ করবে। তখন প্রশ্ন রাখতে চাই, বর্তমান বিশ্বের ইয়াহুদী এজেন্ট ও আর্ন্তজাতিক সিন্ডিকেটগুলো কি এই ইসলাম নির্ভর টিভি চ্যানেল চলতে দিবে? কিছুতেই দিবে না। আলজাজিরাসহ এমন অনেক উদ্যোগ আমাদের সামনে। আমার জানামতে সেই টিভির প্রচার কার্যক্রম জ্যাম করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আপনার সেই টিভি চ্যানেল গোটা পৃথিবীর টিভি সম্প্রচার আইনের তোয়াক্কা না করে নিজস্ব কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবে না। এর জন্য আফগানিস্তানের তালিবান শাসনের উদাহরণই যথেষ্ট। বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্রশক্তি ঐ দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতিটি ইট এ অপরাধেই খুলে নিয়েছে যে, তারা বৈশ্বিক কুফুরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশ হতে অস্বীকার করে ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের যে পরিণতি হয়েছিল আপনার ইসলামী টিভি চ্যানেলেরও সেই পরিণতি হবে।

প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ ইসলামিয়া বাইতুন নূর যাত্রাবাড়ি।
খতীব, মগবাজার ওয়ারলেস গেট, চৌরাস্তা জামে মসজিদ।

গ্রন্থ পরিচিতি

বেহেশতী যেওর ও কিছু কথা

মাওলানা ইবরাহীম

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরী চৌদ্দ শতকে তাজদীদে দীনের সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় হাজার খানেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিছু গ্রন্থে খালেস ইলমী ও গভীর তাহকীকী আলোচনা করেছেন, যা থেকে কেবল উলামায়ে কেরাম পরিপূর্ণ উপকৃত হতে সক্ষম। তার কিছু গ্রন্থ এমনও রয়েছে যা সর্বসাধারণের দীনের পথে চলার পথকে সুগম ও সহজতর করে তোলে। তেমনি এক অমর গ্রন্থ বেহেশতী যেওর।

গ্রন্থকার : সর্বজন সমাদৃত বিখ্যাত এ কিতাবটির সংকলক একনিষ্ঠ দাঈ, জগদ্বিখ্যাত আলেমে দীন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ইবনে আব্দুল হক থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনগণের কাছে তিনি 'হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত' উপাধিতে অধিক পরিচিত। তিনি হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশের মুজাফ্ফর নগর জেলার থানাভবন এলাকার এক দীনী খান্দানে ১২৮০ হিজরীর রবীউস সানীর ৫ তারিখ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। থানাভবনে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তিনি 'থানবী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিজ গৃহে তিনি পবিত্র কুরআনের হিফজ সমাপন করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ইলম ও উলামায়ে কেরামের প্রতি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ইবাদত বন্দেগীতে অতি আগ্রহী। অহেতুক কর্মকাণ্ড-বিমুখ ও অত্যন্ত নম্র স্বভাবের অধিকারী। নম্রতা ছিল তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ দান। তিনি বার বছর বয়স হতেই তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। ফারসী ও আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান নিজ এলাকার উস্তাদগণ থেকে লাভ করেন। অতঃপর ১৫ বছর বয়সে দেওবন্দের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। সেখানে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ., মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. ও দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.সহ জগদ্বিখ্যাত আলেমে দীনগণের সান্নিধ্যে উলূমে আরবী ও আদবী (আরবী ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান), উলূমে আকলী ও নকলী (কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তি-তর্ক) অর্জন করেন। কিতাব মুতালাআ, উস্তাদগণের খেদমত ও তাদের সোহবত ছাড়া অন্য কোন ব্যস্ততা ছিল না তার। দেওবন্দ এলাকায় অনেক আত্মীয় স্বজনের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন না। তিনি বলতেন এ উদ্দেশ্যে আমি এখানে আসিনি। দারুল উলূম দেওবন্দে ৫ বছর অধ্যয়ন করে ১৩০০ হিজরীতে তিনি শিক্ষা সমাপন করেন।

খিদমতসমূহ : শিক্ষাসমাপনীর পর তিনি ১৪ বছর কানপুরের ঐতিহ্যবাহী দীনী প্রতিষ্ঠান 'ফয়জুল আম' মাদরাসায় শিক্ষকতার খিদমত আঞ্জাম দেন। অতঃপর তিনি তার জন্মস্থান থানাভবনে চলে আসেন। এখানে তার শাইখ সায়্যিদুত তায়েফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ওসিয়ত মুতাবেক 'খানকায়ে এমদাদিয়া'তে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন এবং আজীবন (১৩৬২হিজরী পর্যন্ত) তিনি এখানেই অবস্থান করেন। এখান থেকেই তার হাতে আল্লাহ তা'আলা দীনের বিশাল কর্ম ও কীর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি ছোট বড় প্রায় এক হাজার কিতাব রচনা করেছেন। মুসলমানদের প্রয়োজনীয় দীনের এমন কোন জরুরী বিষয় নেই, যে বিষয়ে হযরত থানবীর কোন কিতাব, পুস্তিকা বা বয়ান সংকলিত হয়নি। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম হযরত থানবী রহ. এর রচনাবলীকে উলূম ও মা'আরিফের দরিয়া শুমার করে থাকেন।

গ্রন্থ রচনায় তার বিস্ময়কর জাদুময়তার এক অনন্য নিদর্শন 'বেহেশতী যেওর' সম্পর্কে এখানে কিছুকথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

বেহেশতী যেওর

কিতাবটি মূলত মুসলিম নারীগণের তা'লীম-তরবিয়ত (ইসলামী বিধি-নিষেধের শিক্ষা ও দীক্ষার) উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। এ কারণেই এতে একজন মুসলিম রমণীর দীন দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় বিষয়াদি একত্রিত করা হয়েছে। তবে ফিকহী মাসাইলের আধিক্যের গুণে কিতাবটি শুধুই মহিলাদের উপকারের জন্য সীমিত থাকেনি; বরং উচ্চ পর্যায়ের উলামা-মাশাইখ ও ফকীহগণের জন্যও কিতাবটি পথের মশাল প্রমাণিত হয়েছে। এ কিতাব থেকে এ যুগের কোনও মুফতী অমুখাপেক্ষী নয়। এ মাকবুলিয়াত সম্ভবত বেহেশতী যেওর ছাড়া উর্দূ ভাষার অন্য কোন কিতাবের ভাগ্যে জোটেনি।

কিতাবটি যেহেতু নারীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে তাই ফিকহী মাসাইলের পাশাপাশি নারীদের সম্ভবত দুনিয়া ও আখিরাতের কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়েনি। বসবাসের আদাব, সন্তান প্রতিপালনের নিয়মাবলী, ঘরোয়া জরুরী জিনিসপত্র, চিকিৎসা বিষয়ক টিপস, মহিলাদের হাতের কাজ এমনকি বিস্কুট, পিঠা, কেক, আচার ইত্যাদি প্রস্তুত প্রণালী মোটকথা মহিলাদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় এখানে বিদ্যমান। বাস্তবতা হলো, যে সকল মহিলা বেহেশতী যেওর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তারা বর্তমানের গ্রাজুয়েট মহিলাদের তুলনায় বহুগুণে বেশি পরিপাটি ও রুচিশীল হয়ে থাকেন। যেহেতু থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কোনও কিতাবের স্বত্বাধিকার নিজের জন্য রাখেননি এবং কোন কিতাবের জন্য রয়্যালিটি (সাময়িক ছাপার জন্য প্রকাশক কর্তৃক লেখককে দেয়া সম্মানী) গ্রহণ করেননি, তাই উপমহাদেশের বহু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কিতাবটি অসংখ্যবার প্রকাশ করেছে। এতে বিভিন্ন মুদ্রণে অনেক পার্থক্যও হয়ে গেছে। কোন কোন সংস্করণে বিশুদ্ধতার দিকটি তেমন লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোনটিতে আবার মাসআলার নিচের টীকা বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি অনুধাবন করে হযরত থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ভাতিজা হযরত মাওলানা শাব্বীর আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (যিনি থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর জীবদ্দশায় তার কিতাবগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন) নতুন করে বেহেশতী যেওর প্রকাশের উদ্যোগ নেন। এ পর্যায়ে তিনি বেহেশতী যেওরের সেই বিশেষ কপিটিকে মূল হিসেবে গ্রহণ করেন যার উপর শেষবারের মত থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নজর বুলিয়েছেন। যার প্রত্যেক মাসআলার টীকায় তার হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এই কপিটিকে মূল

ধরে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টের সাথে পরিশুদ্ধ করণের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সাথে সাথে টীকাগুলো নতুন করে সাজিয়েছেন এবং মাসআলার শুধু হাওয়ালা উল্লেখ করেই ছেড়ে দেননি; প্রতিটি হাওয়ালার মূল ফিকহী ইবারতটিও উল্লেখ করেছেন এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য মেহনত ও অনসুন্ধানের পর তা পুনঃপ্রকাশ করেছেন। (আল্লাহ তা'আলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।)

এই কপিটির ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা আলেমে দীন হযরত মওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, এই কপিটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ, সুবিন্যস্ত, বহুল প্রচলিত ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

বেহেশতী যেওরের মূল্যবান এই সংস্করণটিও ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে যাচ্ছিল। তা অনুধাবন করে করাচীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দারুল ইশাআত' কর্তৃপক্ষ কিতাবটি পুনঃপ্রকাশ করেছে। দারুল ইশাআতের এই সংস্করণে অতিরিক্ত বেশ কিছু প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে। তা হলো, ইতিপূর্বে বেহেশতী যেওর ১১ খণ্ডের প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠা নম্বর আলাদা ছিল এবং প্রতি খণ্ডের সূচীও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ফলে প্রয়োজনীয় মাসআলা খুঁজে বের করা ছিল অনেক কষ্টসাধ্য। দারুল ইশাআতের এই সংস্করণে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে এবং পুরো কিতাবের বিস্তারিত সূচী কিতাবের শুরুতেই একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে কিতাব থেকে মাসআলা অনুসন্ধান এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

দারুল ইশাআতের এই অনন্য সংস্করণটিও জামি'আ রাহমানিয়ার 'দারুল ইফতায়' (২৩২২ নং অন্তর্ভুক্তিতে) সংরক্ষিত আছে। হযরত থানবীর হাতে গড়া শাগরেদ মুজাহিদে আযম হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বেহেশতী যেওর তরজমা করেছেন যাতে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানগণও এ কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারে।

সারকথা, বেহেশতী যেওর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর লেখা অনন্য একটি কিতাব, গোটা উপমহাদেশে যার নযীর মেলা কঠিন। হাতে গোনা কিছু লা মাযহাবী ছাড়া এমন কোন লোক নেই যিনি কিতাবটির উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কিতাবটিকে যথার্থ মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন।

লেখক, শিক্ষার্থী, দারুল ইফতা
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আমি আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, খাবার শেষ হয়ে গেলে সন্তানগুলো আবার ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করবে। বেদনার ভারি বোঝা নিয়ে বাবাকে আবারো ছুটতে হবে কাজের খোঁজে, খাবারের আশায়। সমাজের ধনী লোকেরা যদি গরীবদের পাশে দাঁড়াতো, যদি আল্লাহর বিধান অনুসারে শতভাগ যাকাত আদায় করা হতো, তাহলে কি এরা এমন নির্মম পরিণতির শিকার হতো?

মাহদী হাসান বিন আব্দুল খালেক
ত্রিশাল, মোমেনশাহী।

যমুনার পাড়ে একদিন

যমুনার পাড়। সন্ধ্যা ও প্রাত ভ্রমণের জন্য বেশ উপযুক্ত। চারদিকে সবুজের সমারোহ। নয়নাভিরাম ফসলের মাঠ। উপরে খোলা নীলাকাশ। নীচে সবুজের গালিচা। এরই মধ্য দিয়ে একে বেঁকে চলে গেছে মেঠোপথ; শেষ প্রান্ত তার যমুনার তীর ছুঁয়েছে। পথের দু'পাশে হরেক রকমের গাছ-গাছালি।

পড়ন্ত বিকেল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। বাতাসের আলতো ছোঁয়া দেহমনে তুলছে শিহরণ। কলকল রবে আপন গতিতে বয়ে চলছে যমুনা। সন্ধ্যার সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। যেন যমুনার বুকে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। দিগন্তের লালিমা অস্ত যাওয়া অবধি সেই রূপসুধা আকণ্ঠ পান করলাম। ভাবতে লাগলাম, আমার জীবন-সন্ধ্যাটি কি জগতের বুকে এমন অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারবে।

হুসাইন আল ক্বায়স
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

আরো যারা লেখা পাঠিয়েছে...

সাঈদ সফওয়ান, দোহার, ঢাকা।
মুখতারুল ইসলাম, পঞ্চগড়।
সুলতান মাহমুদ, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল।
ইবরাহীম খলীল, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
কবীর হুসাইন, চরওয়াশপুর মাদরাসা।
শরীফুল ইসলাম, লালমোহন, ভোলা।
শরফুদ্দীন, চরওয়াশপুর মাদরাসা।
সাইফুল্লাহ, মতলব, চাঁদপুর।
আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ফয়সাল, লালবাগ, ঢাকা।
নাজমুল হাসান, চাঁদপুর।

(৩৫ পৃষ্ঠার পর)

উদ্দেশ্য, 'ভালো ভালো' অনুষ্ঠানগুলো যাতে বেহাত না হয়ে যায়। আল্লাহর পানাহ! এদের কাছে ঈদ কেমন কাটলো জানতে চাইলে উত্তর দেয়, না ভাই! কোথাও যাওয়া হয়নি, বাসায় টিভি দেখে সময় কাটিয়েছি। বন্ধুগণ! ঈদের মতো মহামূল্য সময়টি এভাবে 'কাটাতে' থাকলে সে দিন দূরে নয়, মুসলমানের খাতা থেকেই আমার নামটি 'কাটা' যাবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে গান-বাজনা ও ব্যান্ড পার্টির আয়োজন : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আনন্দ অনুষ্ঠান, ঈদ পুনর্মিলনী ইত্যাদির নামে ঈদের দিন বা পরের দিন নাচ-গান ও আমোদ-ফুর্তির আয়োজন করা হয়। এসব 'মাস্তি-মৌজ' দেখে মনে হয়, সারা বছরের হারাম গান-বাজনা ঈদের দিন যেন হালাল হয়ে গেছে। বস্তুত হারাম কাজে দুঃসাহস দেখানো ও তাকে হালকা মনে করা ধ্বংস ও বরবাদীর এক মহাসংকেত।

শেষকথা

ঈদুল ফিতর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় একটি নেয়ামত। এ দিন রোযাদার মুমিনকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাগফিরাত ও দয়ার চাদরে ঢেকে নেন। সুতরাং শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দিনটিকে গুনাহ ও নাফরমানীমুক্ত নির্মল আনন্দ ও ইবাদতের যুগপৎ আবহে পালন করা উচিত।

সিনিয়র মুহাদ্দিস; বিভাগীয় প্রধান,
তাফসীর বিভাগ: জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া।

সহীহ হাদীস মানার নামে অসংখ্য হাদীস অস্বীকারকারী , হযরত সাহাবায়ে কেরামকে বিদ'আতী আখ্যাদানকারী, যামানার সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনা লা-মাযহাবীদের ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচনে **শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক** লিখিত প্রমাণসমৃদ্ধ তিনটি কিতাব সংগ্রহ করুন।

১. কুরআন সুন্নাহর আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
২. তুহফাতুল হাদীস
৩. হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

যোগাযোগ
মুফতী শফীক সালমান কাশিয়ানী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট
সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল: ০১৭৪৭৯৯৯৭৩, ০১৬৮৮৭৪৬০৫৯

ঈদ পালনের শরয়ী পদ্ধতি

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসউদ

আনন্দ-উৎসব মানুষের স্বভাবজাত একটি চাহিদা। আনন্দ যখন ব্যক্তি ছাড়িয়ে জনগোষ্ঠিকে স্পর্শ করে তখন তা উৎসব। আরবী ভাষায় আভিধানিক অর্থে এরই নাম ঈদ। স্বভাবধর্ম ইসলামে মানুষের উৎসব চাহিদাকে অস্বীকার করা হয়নি এবং হালকাভাবেও নেয়া হয়নি। জাহেলিয়াত-নির্ভও উদ্দেশ্যবিহীন ও বল্গাহীন উল্লাসকে ইসলাম শুধু উদ্দেশ্যমুখর করেছে এবং তাতে পদ্ধতি ও মাত্রার লাগাম এঁটে দিয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠিরই ঈদ-উৎসব রয়েছে। আর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা আমাদের উৎসবের দিন'। জানা গেল, ইসলাম কোনও শুষ্ক ও নিরস ধর্ম নয়। এতে চিত্তবিনোদনেরও সুযোগ দেয়া হয়েছে। তবে তার ব্যবহারিক দিক ও উদযাপন পদ্ধতি মনগড়া কিংবা ইচ্ছা মাফিক নয়; উদ্দেশ্য সাপেক্ষ ও নিয়মের অধীন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে দেখলেন, মদীনাবাসী বছরের দুটো দিন ঘাঁ করে আনন্দ উদযাপন করে। তিনি জানতে চাইলেন, এর তাৎপর্য ও ইতিহাস কী? গাহাবায়ে কেরাম বললেন, জাহেলী যুগে এ দুটো দিনে আমরা খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদে কাটাতাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ দিন দু'টিকে তার চেয়ে উত্তম দু'টি দিনে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তা হলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (সুতরাং এখন আর ও দু'টোর প্রয়োজন নেই)।

কার জন্য ঈদের আনন্দ, কার জন্য নয়

দুঃখের পর সুখ, বেদনান্তে আনন্দ এবং ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম চিরকালই উপভোগ্য। সে জন্যই বোধ হয় সিয়াম-সাধনার সমাপ্তিতে ঈদুল ফিতরের ব্যবস্থা। দীর্ঘ এক মাস দিন-রাত্রির মেহনত শেষে প্রাপ্তি ও পুরস্কারের ঘোষণা আনন্দেরই বটে। সিয়াম-সাধকেরা এ দিন দয়াময়ের বিশেষ ক্ষমা ও সবিশেষ করুণা লাভ করেন। তৃপ্ত ও আনন্দিত হন। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এবং নিয়মমাফিক এ প্রাপ্তি ও পরিতৃপ্তি রোযাদারের জন্য সংরক্ষিত। যে প্রাপ্তবয়স্ক বিনা কারণে রোযার পরিশ্রম স্বীকার করে না, আবার 'নেমন্তন্ন' ছাড়াই ঈদগাহে হাজির হয় তার জন্য দিনটি عيد নয় وعيد তথা পুরস্কার নয় তিরস্কারের। তবে বয়স আর ওযর যাদেরকে রোযা রাখা থেকে বিরত রেখেছে; আগ্রহ ও আফসোস তাদেরকেও সৌভাগ্যবানদের কাতারে শামিল রাখবে ইনশাআল্লাহ। অর্থাৎ ঈদের আনন্দে এদের জন্যও বরাদ্দ আছে; নেই শুধু হতভাগা পেট পূজারীদের। কিন্তু বিনা দাওয়াতী মেহমানের মতো ঈদ পালনে এসব 'পেটের বান্দা'দেরকেই বেশি তৎপর দেখা যায়। এদের ঈদ প্রোগ্রাম, শুভেচ্ছা বিনিময়, ঈদ কেন্দ্রিক কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া, হৈ হুল্লোড় আর ব্যতিব্যস্ততা দেখে মনে হয়, ঈদটি যেন হঠাৎই ভূঁই মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে; এক মাস সিয়াম-সাধনার সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আল্লাহর পানাহ।

ঈদ পালনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

অন্যান্য জাতি গোষ্ঠি ও ধর্মাবলম্বীরা তাদের উৎসব-দিবসে অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। সাধারণ অবস্থায় নিষিদ্ধ ও লজ্জাকর কর্মকাণ্ডও এসব দিনে বৈধ মনে করা হয়। বাধা-নিষেধের দেয়াল ও আঁড়ালকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা হয়। মনে হয় যেন নিয়ম ভাঙ্গাই এসব দিবসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। উদাহরণত হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ও তার পালন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি জানেন, উৎসবের বাহানায় দূর্গা পূজা ও হোলি উৎসবে তাদের নারী পুরুষেরা কতোটা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অবাধ মেলামেশা ও এই বিষয়ক স্বেচ্ছাচারিতা কতোটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং নগ্নতাও অবস্থাদৃষ্টে কিভাবে লজ্জা পায়! আর খ্রিস্টানদের বড়দিনে তো অন্যায় অপরাধ সারা বছরের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়। শরাব-কাবাব, সাকী-সুরাহী সব সেদিন মৌরুসি সম্পত্তি; যেভাবে খুশি যতোটা খুশি লুটে নেয়া যায়। কিন্তু ইসলাম ভদ্রতা, শালীনতা ও আনুগত্যেও ধর্ম। আখেরাতমুখী এ ধর্মে পার্থিব ভোগ-বিলাস আর আনন্দ-উৎসবে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই। ইসলাম এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। উৎসব পালনে ও ঈদ উদযাপনে তার আছে 'ধন্য' ভাবনা ও 'ধনন্য' রীতি। অন্যান্য জাতি ধর্মেও আনন্দ-উৎসব ঐচ্ছিক ব্যাপার। মন চাইলে কেউ গীর্জা-মন্দিরে যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। কিন্তু রোযাদারের জন্য ঈদ পালন ঐচ্ছিক বিষয় নয়; ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ও সওয়াব অর্জনের মাধ্যম। ঈদের দিন হাসিখুশি থাকা ও সাধ্যানুযায়ী আনন্দ প্রকাশ করা নববী আদর্শ। অন্যান্য জাতির উৎসব-দিবসে নিয়মিত বিধি-বিধানকে শিথিল মনে করা হয়। আর ইসলামকে দেখুন, বছরের আর দিনগুলোকে বেতেরসহ ছয় ওয়াক্ত নামায বিধিবদ্ধ হলেও ঈদের দিন দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়া হয়। ঈদগাহে গিয়ে বিশেষ নিয়মে দু' রাকাআত নামায অতিরিক্ত আদায় করতে হয়। নামাযান্তে দু'টি খুতবা শোনতে হয়। ঈদগাহে আসা যাওয়ার পথে তাকবীর বলতে হয়। অধিক পরিমাণে দান খয়রাতে উৎসাহ দেয়া হয়। গরীব-দুঃখী, অভাবী-অনাহারীর প্রতি সহমর্মিতার তাগিদ দেয়া হয়। মোটকথা, শিথিল তো নয়ই দায়িত্ব বরং বাড়িয়ে দেয়া হয়। এটা কেবল ইসলামেরই সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্য যে, উৎসবের দিনে দায়িত্ব কমানো হয় না, বাড়ানো হয়।

ঈদের রাতের আমল

এক মাস সিয়াম-সাধনার পর ঈদের চাঁদ দেখা গেলে বহু রোযাদারের সংযম ছুটে যায়। রমাযানের দিন-রাতগুলো ইবাদত বন্দেগীতে কাটালেও চাঁদ ওঠার পর সবকিছুর যেন ছুটি হয়ে যায়। অথচ ইসলাম চায় রমাযানে অর্জিত আমলের ধারাবাহিকতা সারা বছর বজায় থাকুক। আখেরাতের ফসল তোলার একটা সুযোগও বান্দার হাতছাড়া না হোক এবং একটা মুহূর্তও সে উদাসীন না থাকুক। আর এর শুরু হোক ঈদের রাত থেকেই। মূলত ব্যাপক গাফলতের সময় যে ব্যক্তি সচেতন থাকে তার মূল্যায়ন সব সময়ই বেশি হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
অর্থ : যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী করবে তার অন্তর সে দিনও মরবে না যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে। (আল আযকারুন নববিয়্যাহ ১/৩৭৫)

ঈদুল ফিতরের সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ

#নিজ মহল্লার মসজিদে ফজর নামায আদায় করা। #মিসওয়াক করা।

#গোসল করা। # খুশবু ব্যবহার করা। # সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হলে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করা। # সাধ্যানুযায়ী উত্তম কাপড় পরিধান করা। # খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা। # ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু নাস্তা করা। # ঈদুল ফিতরে বেজোড় সংখ্যক খেজুর অথবা মিষ্টি জাতীয় খাদ্য দ্বারা এই নাস্তা সম্পন্ন করা। # সামর্থ্য অনুযায়ী অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করা। # পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন করা। # ধীরস্থিরভাবে ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব। # ঈদগাহে এক পথে যাওয়া অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করা। # ঈদের জামা'আত ঈদগাহে করা। # ঈদগাহে গমনকালে নিম্নস্বরে তাকবীরে তাশরীক বলা।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

ঈদের দিনের মাকরূহ কাজ

ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদগাহ, মসজিদ বা ঘরে নফল নামায পড়া মাকরূহ। এমনকি মহিলাদের জন্যও ঈদের নামাযের পূর্বে ইশরাক বা চাশতের নামায পড়া মাকরূহ। অনুরূপ ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল পড়াও মাকরূহ। তবে ঘরে ফিরে পড়া যাবে।

ঈদের দিনের কিছু রসম রেওয়াজ ও তার পর্যালোচনা

নতুন কাপড় পরিধান করা : শরীয়তে ঈদের দিন নতুন কাপড় পরার বাধ্য-বাধকতা নেই। মূলত নিজের ব্যবহারের সবচেয়ে ভালো, পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও শরীয়তসম্মত পোশাকটি পরিধান করা ঈদের সুন্নাত। আনকোরা নতুন কাপড়ই পরতে হবে; সামর্থ্য না থাকলেও ধার কর্জ করে যোগাড় করতে হবে– এটা ঠিক নয়। তবে পরিবার-প্রধানের সামর্থ্য থাকলে নিজের ও অধীনস্তদের জন্য নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করা ভালো। এতে অপরকে খুশি করার সওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল ঈদ উপলক্ষে সবচে' দামী, সবচে' সুন্দর ও আধুনিকতম ডিজাইনের কাপড় সংগ্রহ করার রীতিমত প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এভাবে লোকদেখানো ও গর্ব-গৌরবের উদ্দেশ্যে কাপড় সংগ্রহ করা ও পরিধান করা বিলকুল হারাম। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হলে অসুবিধা নেই।

পুরুষ লোকের সিল্কের পোশাক পরিধান: ঈদের দিন অনেক নামাযীকে সিল্কের (যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সুতা অথবা শুধু প্রস্থ সুতা সিল্কের) পাঞ্জাবী পরে ঈদগাহে হাযির হতে দেখা যায়। পুরুষের জন্য সাধারণ অবস্থায়ই এ কাপড় পরা হারাম। তাহলে ভাবা উচিত, ক্ষমা ও পুরস্কারের আশায় এ কাপড় পরে ঈদগাহে হাযির হওয়া কতোটা গর্হিত অপরাধ হবে? মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রদ্রোহীর প্রাপ্য পুরস্কার নয় তিরস্কার।

খানা পিনা ও মেহমানদারীর আয়োজন : ঈদের দিন পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য ভালো খানাপিনার আয়োজন করা হয়ে থাকে। আয়োজনকারীর শরীর-স্বাস্থ্য, সময় ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হলে ভালো। এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আর দিনগুলোর মতো সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা করা কিংবা ধার-কর্জ করে উন্নত খানার আয়োজন করা দু'টোর কোনটিই কাম্য নয়। লক্ষণীয় হল, ঈদের দিন সাধারণত খানা-পিনার অপচয় করা হয়; অনেক খাবার নষ্ট করা হয়। তেমনটি হলে ঈদ পালনকারীকে গুনাহের বোঝাও সামলাতে হবে। সুতরাং মধ্যপন্থা কাম্য।

মসজিদ ও ঈদগাহ লাইটিং করা, কাগজ কেটে সুসজ্জিত করা

ঈদ উপলক্ষে মসজিদ ও ঈদগাহে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা ও শোভাবর্ধনের নামে বাড়াবাড়ি করা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত ও নিষিদ্ধ। অবশ্য নামাযে এতমিনানের স্বার্থে ঈদগাহকে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করা এবং এ কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। কোন কোন এলাকায় তরুণ-যুবকেরা ঈদগাহের 'ডেকোরেশন' এর নামে নামায শেষে মুসল্লীদের কাছ থেকে বখশিশ আদায় করে এটাও পরিত্যাজ্য। প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতার কাজ কেউ চাইলে স্বেচ্ছাশ্রমে করতে পারে। তবে ঈদগাহ কর্তৃপক্ষের লোক ভাড়া নিয়ে করানোই উত্তম। যাতে মুসল্লীদের অযথা বিরক্ত করতে না হয়।

মসজিদ কেন্দ্রিক ঈদের জামা'আত

ঈদের জামা'আত মসজিদ কেন্দ্রিক না হয়ে এলাকা ভিত্তিক ও ঈদগাহ কেন্দ্রিক হওয়া শরীয়তের কাম্য। যেন বেশি থেকে বেশি মুসলমান একাত্ম হয়ে ঈদের খুশি উদযাপন করতে পারে। শহর তো শহর এখন গ্রামেও মসজিদ ভিত্তিক দেড় দুইশ' লোক নিয়ে ঈদের জামা'আত করতে দেখা যায়। এতে নামায তো হয়ে যাবে কিন্তু শরীয়তের মাকসাদ ও মান্‌শা বিনষ্ট হবে। এজন্য বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে অন্ততঃ ৫/১০টি মসজিদের সমন্বয়ে ঈদের জামা'আত করার পরামর্শ দেয়া হল। এটা ইসলামের শান-শওকত ও ভাব-গাম্ভীর্য প্রকাশে অত্যন্ত সহায়ক হবে। অমুসলিমরা এর সৌন্দর্য লক্ষ্য করে প্রভাবিত হবে।

ঈদের মাঠে খতীব, ইমামদের বোনাস ও হাফেযদের 'হাদিয়া' কালেকশন

তারাবীহর ইমামের জন্য হাদিয়া কালেকশন তো মসজিদে, ঈদগাহে কোথাও জায়েয নেই। অনুরূপ খতীব, ইমামের বোনাস বা ঈদগাহের উন্নতির জন্য রুমাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে কালেকশনও পছন্দনীয় নয়। এটা খতীব-ইমামের সম্মানহানীর কারণ। আর ঈদগাহের উন্নতির জন্য ঈদের নামাযের পরে নয়; রমাযানে বা অন্য কোন সময় কালেকশন করা উচিত। ঈদগাহকে সম্পূর্ণ কালেকশনমুক্ত রাখাই শ্রেয়। একান্ত প্রয়োজনে মিম্বরের কাছাকাছি বা ঈদগাহের প্রবেশ ও নির্গমন পথে 'মসজিদ' 'মাদরাসা' ইত্যাদি শিরোনাম লিখে বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে এবং ঘোষণা করা যেতে পারে যে, এসব ব্যাপারে কেউ সহযোগিতা করতে চাইলে সে যেন উক্ত বাক্সে তা প্রদান করে।

ঈদের দিন যোহর ও জুমু'আর নামাযে শিথিলতা

কুরবানীর ঈদের দিন অনেক পাক্কা মুসল্লীও গোশত বানানো ও বিলি-বণ্টনের কাজে যোহরের নামায কাযা করে ফেলে। অন্তত জামা'আত তরক তো হয়েই যায়। আর জুমু'আর দিন হলে কোনমতে দৌড়ে এসে জামা'আত ধরা হয়। খুতবা শোনার তো খবরই থাকে না। শুধু কুরবানীই নয়; ঈদুল ফিতরের দিনেও এ ব্যাপারে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। এটা সংশোধনযোগ্য।

ঈদ মোবারক ও সাহাবায়ে কেরামের ঈদ অভিবাদন রীতি

সাধারণতঃ ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে ঈদের কয়েক দিন পর পর্যন্ত দেখা সাক্ষাতে ও টেলিফোনে ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। আমাদের দেশে এক্ষেত্রে 'ঈদ মোবারক' বাক্যটি বহু পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত। এটা অবৈধ বা দোষণীয় নয়। কিন্তু কথা হলো, কারো জন্য ঈদ বরকতময় হওয়া বা না হওয়া দু'আ-মূলক এ বাক্যটির নির্ভর করে না। ঈদ বরকতময় হয় রোযার ফরয বিধান পালন করা এবং বিনা ওযরে তা তরক না করার ভিত্তিতে। যার সিয়াম-সাধনা যতো বেশি আবেগ-উদ্দীপনা ও আদব-মাসআলা সমৃদ্ধ হবে

কেউ 'ঈদ মোবারক' বলুক আর না বলুক তার ঈদ 'মোবারক' হবেই। পক্ষান্তরে যে সুস্থ-সবল জোয়ান মানুষটি রমাযান মাসে দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত থাকেনি পৃথিবীর সবাই মিলে 'ঈদ মোবারক' বললেও তার ঈদ বরকতশূন্যই থেকে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন পরস্পরে এভাবে ঈদ-শুভেচ্ছা জানাতেন, تقبل الله منا ومنك (আল্লাহ তোমার ও আমার ঈদ, রোযা কবুল করুন)। 'ঈদ মোবারক' সংক্ষিপ্ত ও সহজ হলেও 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকা' এর অন্তর্নিহিত ভাব ও আবেদনটি তাতে অনুপস্থিত। এজন্য ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে বিশেষতঃ উলামায়ে কেরামের মধ্যে এর প্রচলন হওয়া উচিত। অভিবাদন যে বাক্যেই জানানো হোক দেখা সাক্ষাতে এবং টেলিফোনে সর্বপ্রথম সালাম দিতে হবে। তারপর অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

মুসাফাহা ও মু'আনাকার বিধান

সাধারণ সমাজে মু'আনাকার বাংলা বলা হয় 'কোলাকুলি'। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তরজমা করেছেন 'গলাগলি'। আরবী 'মু'আনাকা' কোলাকুলির চেয়ে গলাগলিতেই বেশি ফুটে ওঠে। সাধারণতঃ মু'আনাকাকে ঈদের নামাযের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করা হয়। অথচ মু'আনাকার সঙ্গে ঈদের কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই; এটা সব সময়ের সাধারণ একটা আমল। কিছু দিনের বিরতির পর যখন দু'জন মুসলমান একত্রিত হন তখন মু'আনাকা করা সুন্নাত। আর দৈনন্দিনের দেখা-সাক্ষাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত। মুসাফাহা এক হাতে নয় দু' হাতে করতে হয়। আর মু'আনাকায় শুধু বুক নয় পরস্পরে ডানদিকে একবার গলা মিলাতে হয়। হাদীসে তিনবার মিলানোর কথা পাওয়া যায় না। শরীয়তে ঈদের নামাযের পর ঈদের দিনের আমল হিসেবে মুসাফাহা, মু'আনাকা করার প্রমাণ নেই। সুতরাং তা পরিতাজ্য।

ঈদ পালনে অনৈসলামী রীতি-নীতি অবলম্বন

পূর্বে বলা হয়েছে, শরীয়তে ঈদ পালন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ও সওয়াবের বিষয়। সুতরাং বলা বাহুল্য, তাতে বিজাতীয় রীতি ও পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটানো চরম অপরাধ। ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ, সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম। এতে মানুষের প্রয়োজনীয় বিনোদনের যথেষ্ট বৈধ উপাদান রয়েছে। বিজাতীয় বলে সন্দেহ হয় মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে ইসলাম এমন একটি শব্দও মুসলমানদের জন্য সমীচীন মনে করে না। উদাহরণতঃ راعنا এবং انظرنا শব্দ দু'টির মর্ম হলো, হে নবী! নসীহত করার সময় আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, ধীরে সুস্থে বলুন। এ মর্মে দু'টি শব্দই বিশুদ্ধ ও সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ। কিন্তু ইহুদীরা তাদের নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গিতে راعنا শব্দটিকে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করতো। বিধায় আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে উল্লিখিত মর্মে মুসলমানদেরকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে বারণ করে দিয়েছেন। তো ভিনজাতির কৃষ্টির পরিচায়ক একটি শব্দ ব্যবহার-বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি তা থেকে মুসলমানদের বারণ করা হয় তাহলে ঈদ পালনের ইবাদতে বিজাতীয় রীতি-নীতি অবলম্বন করা কতোটা গর্হিত হবে তা সহজেই অনুমেয়।

কবর যিয়ারত : কবর যিয়ারত সর্বকালেই দুনিয়ার চাকচিক্য ও পার্থিব মোহ থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এজন্য জরুরী মনে না করে ঈদের দিন নামাযের আগে/পরে কবরবাসী মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ মুসলমানের যিয়ারতে কোন অসুবিধা নেই। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কারো কারো জন্য এ যিয়ারত ঈদের দিন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার কাজ দেয়।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাত : আনন্দের দিনে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়া আত্মার দাবী। সুযোগ হলে এবং রাস্তাঘাটে বা আত্মীয়-বাড়িতে ফেতনা ও বেপর্দেগীর আশঙ্কা না থাকলে ঈদের দিন সৌজন্য সাক্ষাৎ করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া ভালো।

ঈদসেলামী, ঈদ বখশিশ : ঈদের দিন ছোটরা বড়দের কাছে ঈদ বখশিশ বায়না করে। স্থানভেদে এটাকে ঈদসেলামীও বলা হয়। সামর্থ্য থাকলে ছোটদের এ নির্দোষ দাবী পূরণ করা দোষণীয় নয়। তবে এ টাকা যাতে তারা বেহুদা কাজে ব্যয় না করে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই। *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন* এর লেখক মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. তার সন্তান ও সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়মিত ঈদ বখশিশ প্রদান করতেন। তার সন্তানেরাও (মুফতী রফী উসমানী, মুফতী তাকী উসমানী প্রমুখ) তার কাছে ফি' বছর 'বখশিশ বাজেট' বর্ধিত করার আবেদন জানাতেন। তিনিও সামর্থ্য অনুযায়ী তা বাড়িয়ে দিতেন। এ এক নির্দোষ আনন্দ বৈ কি।

আতশবাজি ও পটকা ফাটানো : ঈদের চাঁদ উঠার সাথে সাথে বরং দু' একদিন আগে থেকেই প্রায় সব অঞ্চলে আতশবাজি ও পটকা ফাটানোর ধুম পড়ে যায়। এটা হিন্দু ও বিধর্মীদের উৎসব পালনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ; ইসলামের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। অর্থ অপচয়ের পাশাপাশি এ কাজে অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এখন খোলামেলা একটি বিষয়। সুতরাং তা বিলকুল পরিতাজ্য।

সেজেগুজে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা : ঈদের দিন ভালো পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া আল্লাহ পাকের একটি বড় নিয়ামত। এটা অপাত্রে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কাজেই ঈদের দিন সেজেগুজে অহেতুক রাস্তাঘাটে টহল দেয়া এমনকি শিশুদের জন্যও উচিত নয়। প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য তো প্রশ্নই আসে না। প্রায়-বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতা জরুরী। কেননা এতে বেপর্দেগীসহ নানাবিধ ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে।

'পবিত্র ঈদ' উপলক্ষে সিনেমা-নাটকের 'শুভ' মুক্তি : উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কেউ যদি জেনে বুঝে গুনাহের কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করে সে কাফের হয়ে যায়। কারণ হারামকে বৈধ মনে করা বা হারাম কাজে আল্লাহর নিকট বরকত ও সাহায্য প্রার্থনা করা জঘন্য কুফরী। তাহলে এটা কি ধরনের জাহালাত আর ধর্মহীনতা যে, ঈদের মতো পবিত্র একটি ইবাদতকে সিনেমা-নাটকের মতো জঘন্য হারাম দ্বারা কলুষিত করা হচ্ছে! তাও আবার গর্ব-গৌরবের সাথে। এই 'শুভ' মুক্তি জীবন ও যিন্দেগীকে অভিশাপের হাতে বন্দি করা ছাড়া আর কী উপকার করবে? ঈদের সাথে এসব নোংরামীর কী সম্পর্ক? ভারবাহী প্রাণীবিশেষও সম্ভবতঃ এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল; বেপরোয়া কেবল মানুষ নামের কিছু নির্ভার জীব।

রেডিও টিভির অনুষ্ঠান দেখে ঈদ কাটানো : ঈদের কয়েক দিন আগে থেকেই রেডিও ও টিভি চ্যানেলগুলো পত্র-পত্রিকায় ঈদ উপলক্ষে আয়োজিত তাদের অনুষ্ঠানমালা ও সময়সূচী প্রকাশ করে। নামসর্বস্ব বহু মুসলমান ওসব সময়সূচী খুঁজে-ঘেঁটে 'চয়েজফুল' আরেকটি সূচী বানায়।

(৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আকাইদ

মুহাম্মদ নাঈম
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

১৭ প্রশ্ন : (ক) আমরা চারজনকে খলীফা বলি কেন? খলীফা কি চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? মু'আবিয়া রাযি. ও ইয়াযীদকে কেন খলীফা বলি না?

(খ) কেউ যদি খলীফাদের মধ্য থেকে কাউকে কটুক্তি করে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে ফাসেক সাব্যস্ত হয় কি না?

(গ) শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা (সাধারণ উম্মত) এবং সাহাবীগণ কি সমতুল্য, না তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে?

উত্তর : (ক) অতীতের যে সকল মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান মোটামুটিভাবে শরীয়তের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তাদেরকেই মুসলমানেরা খলীফা বলে থাকেন। খলীফা চারজনকেই বলা হয় এ ধারণা ঠিক নয়। বরং এ চারজনকে খুলাফায়ে রাশেদা বলা হয়। আর শুধু খলীফা উমাইয়া, আব্বাসিয়া ও উসমানিয়াদের অনেককেই বলা হয়। যেমন, খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয, খলীফা হারুনুর রশীদ, খলীফা মামুনুর রশীদ, খলীফা আব্দুল হামীদ প্রমুখ। এ দৃষ্টিতে হযরত মুআবিয়া রাযি.ও একজন খলীফা। কেননা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি একজন উচ্চপদস্থ সাহাবী। আর একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও পরবর্তী যে কোনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চেয়েও বেশি। আর সাধারণ দীনদার মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানকেই যখন খলীফা বলা হয়, তখন তাকে কেন খলীফা বলা হবে না? তবে সাধারণ মুসলমানগণ হযরত মু'আবিয়া রাযি. কে আমীরুল মুমিনীন হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন (যা মূলত খলীফা শব্দেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে)। আর ইয়াযীদকে খলীফা না বলার কারণ হল, সে ছিল সর্বসম্মতিক্রমে ফাসেক ও জালেম। তার আখলাকের এই দুরাবস্থা ক্ষমতা লাভের পর প্রকাশ পেয়েছে। যার আখলাকের এই দুরাবস্থা হয় তার জন্য জরুরী হল, ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি না করে নিজেই পদ ছেড়ে দেয়া। (সূরা সদ- ২৭, সূরা মায়েদা- ৪৭, তাফসীরে মাযহারী ১/৫৭, সফওয়াতুত তাফাসীর ১/৪৮, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যা ৬/২১৭, ইয়াযীদ কী শাখছিয়্যাত; পৃষ্ঠা ১৭৫)

(খ) অতীতের যে সকল শাসকবর্গ খলীফা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা সকলেই সমষ্টিগতভাবে বর্তমান যুগের দীনদার পরহেযগারদের তুলনায় বেশি পরহেযগার ও দীনদার ছিলেন। তাছাড়া তারা তাদের আমল নিয়ে কবরে চলে গেছেন। তাদের কারো যদি কোনো ভুল থেকেও থাকে তা সংশোধনেরও কোনও পথ নেই। সুতরাং তাদের কাউকে কটুক্তি করা বা গালি দেয়া গুনাহের কাজ ছাড়া নেকীর কাজ হতে পারে না। কাজেই তাদেরকে গালি দেয়া, তাদের ওপর অপবাদ আরোপ করা, তাদের গীবত করা সবকিছুই ফাসেকী কাজ। এসব কাজ যারা করবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা ফাসেক। (সূরা হুজুরাত- ১১, সহীহ বুখারী; হা.নং ৭০৭৬, ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৪০, রদ্দুল মুহতার ৪/২৩৭, মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩/২৫০)

(গ) সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. 'মাতবূ' অর্থাৎ দীনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়। সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া সকল উম্মত 'তাবে' অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহাবাদের ঈমানের ন্যায় ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারীদের জন্য ক্ষমা ও বড় প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, যারা সাহাবা রাযি. এর পরিপূর্ণ অনুসারী হবে তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও তাঁদের জন্য বিভিন্ন ঘোষণা রয়েছে। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার সাহাবারা নক্ষত্র তুল্য, যে তাদের অনুসরণ করে চলবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে'। এসব ঘোষণার মধ্যে সকল সাহাবীই অর্ন্তভুক্ত। তাই শরীয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরা এবং সাহাবায়ে কেরাম সমান হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তবে শরীয়তের হুকুম-আহকাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ওপর যেমন ফরয ছিল তেমনি আমাদের ওপরও ফরয। হুকুম-আহকাম পালন আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অর্থাৎ তারা দীনের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর শরীয়তের হুকুম পালন করা ফরয ছিল। আর আমরা তাবে হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ওপর শরীয়তের হুকুম পালন করা ফরয। কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ যিনি সাহাবী নন তিনি একজন আদনা দরজার সাহাবীরও সমকক্ষ হতে পারবেন না। (সূরা বাইয়্যিনাহ- ৮, সূরা বাকারাহ- ১৩, সূরা হুজুরাত- ৩, সূরা তাওবাহ- ১০০, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬৫১, ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম হা.নং ২৫৪১, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবাহ; পৃষ্ঠা ৫)

আব্দুর রহমান
রায়ের বাজার, ঢাকা।

১৮ প্রশ্ন : একজন মুফতী সাহেব বলেছিলেন, ঈমান ও ইসলামের মধ্য থেকে ইসলাম আগে, ঈমান পরে। আমার জানার বিষয় হল, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না? থাকলে সেটা কী? এবং এর মধ্য থেকে কোনটা আগে আর কোনটা পরে? অর্থাৎ কোনটা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত?

উত্তর : ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান হল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত অকাট্য বিষয়ের ওপর অন্তর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। যে বিষয়গুলোকে আমরা ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সাল দ্বারা ব্যক্ত করে থাকি। যাকে আমরা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আভ্যন্তরীণ আনুগত্যও বলতে পারি।

পক্ষান্তরে ইসলাম হল আভ্যন্তরীণ আনুগত্যের পাশাপাশি বাহ্যিক আনুগত্য অবলম্বন করা। যাকে আমরা বাহ্যিক আমল বা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। যথা, (১) কালিমা তাইয়্যিবা ও কালিমা শাহাদাতের মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) রমাযানের রোযা রাখা। (৫) সামর্থ থাকলে হজ্জ করা।

ঈমান যদিও মৌলিকভাবে অগ্রগণ্য। যেহেতু ঈমান ছাড়া কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ঈমান পরিপূর্ণতা

লাভ করে ধীরে ধীরে ও আমলের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে আমল প্রযোজ্য হয় নির্ধারিত শর্তে সামগ্রিকভাবে এবং কবুল হয় ঈমানের ভিত্তিতে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটাকেই অপরটার উপর প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। তবুও ইসলামের অগ্রাধিকার দেয়া যায় এ হিসাবে যে ইসলাম ঈমানের জন্য প্রমাণস্বরূপ হয়ে থাকে।

মোটকথা, দুটোই জরুরী। প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি খুবই জটিল এবং অনর্থক। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য এ সুক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা ফিকিরের কোনও প্রয়োজন নেই; বরং ক্ষতিকর। (সূরা হুজুরাত- ১৪, মিরকাতুল মাফাতীহ ১/৫১, শরহুত তীবী ১/৮৭, ফাতহুল বারী ১/১৪৮, উমদাতুল কারী ১/৪২৮)

ইবাদত

ইমাম

রাজধানী হাউজিং মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৯ প্রশ্ন : আযান বা ইকামতের কোনও শব্দ বা বাক্য যদি ভুলে ছুটে যায়, তাহলে আযান বা ইকামাত কি পুনরায় দিতে হবে?

উত্তর : আযান বা ইকামতের কোনও বাক্য ভুলে ছুটে গেলে আযান বা ইকামত অবস্থায় অথবা আযান বা ইকামত শেষ হওয়ার পরক্ষণেই যদি স্মরণ হয়, তাহলে ছুটে যাওয়া বাক্য থেকে অবশিষ্টাংশ পুনরায় বলতে হবে। আর আযান বা ইকামত শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্মরণ না হয়ে কিছু বিলম্বে স্মরণ হলে, আযান বা ইকামত শুরু থেকে বলতে হবে।

উল্লেখ্য, ফজরের আযানে ছুটে যাওয়া বাক্যটি যদি 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' হয়, তাহলে ঐ বাক্য হতে পুনরায় আযান দেয়া ভাল। কিন্তু আযান শেষ হয়ে কিছু বিলম্বে যদি ছুটে যাওয়া বাক্যের কথা মনে পড়ে, তাহলে আযান পুনরায় দেয়ার দরকার নেই। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৪৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৬)

শরীফুল ইসলাম

সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

২০ প্রশ্ন : আমরা জানি যে, ইমামের সুতরাই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইমামের সামনে সুতরা থাকা অবস্থায় কেউ যদি ইমামের পিছন দিয়ে মুক্তাদীদের সামনে থেকে অতিক্রম করে তাহলে এতে তার গুনাহ হবে কি না? 'ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট' এই মূলনীতি এখানে প্রযোজ্য হবে কি না?

উত্তর : 'ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট' এই মাসআলা ফিকহে হানাফীর অধিকাংশ কিতাবে রয়েছে। এর অর্থ হলো, জামা'আতের সাথে নামায পড়ার সময় ইমামের সামনে সুতরা থাকাবস্থায় কেউ যদি সুতরার বাইর থেকে মুক্তাদীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে এতে অতিক্রমকারীর কোনও গুনাহ হবে না। আর যদি ইমামের সুতরার ভিতর দিয়ে মুক্তাদির সামনে থেকে অতিক্রম করে, এমনিভাবে পিছনের কোনও কাতারে মুক্তাদীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে অতিক্রমকারীর গুনাহ হবে। এসব ক্ষেত্রে ইমামের সুতরা মুক্তাদীর সুতরা নয়। কারণ অতিক্রমকারী তো ইমামের সুতরার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছে।

উল্লেখ্য, যদি কেউ জামা'আতে শরীক হতে এসে তার সম্মুখের কাতারে খালি জায়গা দেখে, তখন সে মুসল্লীদের সামনে দিয়ে সম্মুখের কাতারে যেতে পারবে। এতে তার কোনও গুনাহ হবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৯৩, রদ্দুল মুহতার ১/৬৩৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৩১, মাসাইলে নামাযা; পৃষ্ঠা ১১৬)

২১ প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় আমরা মসজিদে নামায আদায় করছিলাম। নামায অবস্থায় মসজিদের বাইরে বিশেষ একটি ঘটনা ঘটে। কারও কারও মনোযোগ ঘটনার দিকে চলে যাওয়ায় নামাযে থাকা সত্ত্বেও তারা ইমামের সাথে রুকু করেনি। ইমাম যখন সিজদায় চলে গেছে তারাও রুকু না করে সরাসরি সেজদায় চলে গছে। এ অবস্থায় তারা নামায শেষ করেছে। এখন তাদের নামায হয়েছে কি না?

উত্তর : নামাযে কিছু বিষয় আছে যা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই ছুটে যাক নামায হয়ে যায়। যেমন সুন্নাত, মুস্তাহাব। আর কিছু বিষয় আছে যা ইচ্ছাকৃত ছাড়লে নামায ভেঙ্গে যায়। আর অনিচ্ছায় ছাড়লে সাহু সিজদা দ্বারা ক্ষতিপুরণ হয়ে যায়। যেমন ওয়াজিব। আর কিছু বিষয় আছে যা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই ছুটে যাক নামায বাতিল হয়ে যায়। উক্ত নামায শুদ্ধ হওয়ার আর কোন পন্থা থাকে না। যেমন ফরয ছেড়ে দেয়া।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে যে সমস্ত মুক্তাদী রুকূ ছাড়াই নামায শেষ করেছে, তাদের নামায আদায় হয়নি। সুতরাং তাদের নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। (সূরা হজ্জ- ৭৭, বাদায়েউস সানায়ে ১/২৮২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬২, নূরুল ঈযাহ; পৃষ্ঠা ৬৩)

আব্দুল মতিন

হাজারিবাগ, ঢাকা।

প্রশ্ন ২২ : মুফতী মনসূরুল হক সাহেব লিখিত *নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত* বইয়ে 'তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত' শিরোনামে ৩ নম্বরের অধীনে 'গ' তে ফরয নামায শেষ করে সুন্নাতের পর অজিফা পড়ার কথা বলা হয়েছে। আবার এ বইয়েরই 'মুনাজাতের ভুল সমূহ'র ৫ নম্বরে ফরয নামাযের পর দু'আ যিকির না পড়েই সুন্নাত পড়া সুন্নাতের খিলাফ বলা হয়েছে। দুই জায়গার দুই কথা কেমন যেন সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হলো, ফরয নামাযের পর সুন্নাতের আগে কি কি পড়া যাবে? আমি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার আল্লাহু আকবার, তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ, একবার আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়ামিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম এবং একবার 'আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক' পড়ি তাতে কি সব দিক বজায় থাকবে?

উত্তর : ফরয নামাযের পর প্রথমে তিনবার ইস্তিগফার পড়বে তারপর এই দু'আটি পড়বে,

اللّهمّ انت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام.

হাদীসে অন্য একটি দু'আর কথাও এসেছে,

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كلّ شيء قدير أللّهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد.

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের পর এই দু'আ পড়া পরিমাণ বসতেন। (তারপর অবশিষ্ট সুন্নাত ইত্যাদির জন্য দাঁড়াতেন)।

আল্লামা শামী রহ. বলেন, নির্দিষ্ট করে এই দু'আই উদ্দেশ্য নয়। বরং অন্যান্য দু'আও পড়তেন। যেগুলোর পরিমাণ খুব বেশি থাকত না। বরং এই পরিমাণ বা কাছাকাছি থাকত।

সুতরাং বোঝা গেল, ফরয নামাযের পর স্বল্প পরিমাণ দু'আ দুরূদ পড়া যাবে। অবশিষ্ট লম্বা দু'আ ও অযীফা সুন্নাতের শেষে পড়তে হবে। আপনার পঠিত দু'আগুলোর পরিমাণও খুব বেশি না

হওয়ায় তা পাঠ করা যাবে এবং তাতে সব দিক বজায় থাকবে।

উল্লেখ্য, যিকির আযকার এবং দু'আর পূর্ণাঙ্গ ফযীলত লাভের জন্য সেগুলোর উচ্চারণ সহীহ ও শুদ্ধ হওয়া জরুরী।

এই উত্তরের পর *নবীজীর সুন্নাত* নামক বইয়ের দুই জায়গার দুই কথার মধ্যে কোনও সংঘর্ষ হয় না।

عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا ان انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللّهم انت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام.

عن عائشة رضي الله عنها قالت:كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لايقعد الاّ بمقدار ما يقول:اللّهم انت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام.

عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملي عليّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلي معاوية:أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علي كلّ شيء قدير أللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد.

ويكره تاخير السنة الا بقدر: اللهم انت السلام الخ...وقول عائشة رضي الله عنها "بمقدار" لايفيد انه يقول ذلك بعينه بل يقعد بقدر مايسعه ونحوه من القول تقريبا.

(সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৯১, ৫৯২, সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৪৪, ফাতাওয়া শামী ২/৩০১)

প্রশ্ন ২৩ : ফরয নামাযে ইকামত বলা সুন্নাত যা মুয়াযযিন সাহেব বলেন। মসজিদে একা বা সানি জামা'আত করলে কি ইকামত দিতে হবে? বাসায় ফরয নামায পড়লে বা কাযা নামায আদায় করার সময় কি ইকামত দিতে হবে?

উত্তর : মসজিদে একাকি ফরয নামায আদায় করলে ইকামত দিতে হবে না। আর যে মসজিদে নির্ধারিত সময়ে জামা'আতের ইন্তেজাম আছে সেখানে সানী জামা'আত মাকরূহ। তারপরও সেখানে সানী জামা'আত করলে আযান ইকামত দিবে না এবং বারান্দায় বা এক কোণে পড়বে। তাহলে আশা করা যায় মাকরূহ হবে না।

তবে যদি কোনও মসজিদের ইমাম মুয়াযযিন নির্ধারিত না থাকে। বা নির্ধারিত সময় জামা'আতের ব্যবস্থা না থাকে। বরং আগত মুসল্লীরা নিজেদের সুবিধামত নামায আদায় করে। সেক্ষেত্রে উক্ত মসজিদে সানী জামা'আত করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জামা'আতের জন্য আযান ইকামত দুটোই দেয়া যাবে।

উল্লেখ্য, বাসায় অথবা মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ফরয আদায় বা কাযা নামায একাকী পড়লেও ইকামত দেয়া মুস্তাহাব। (আলব বাহরুর রায়েক ১/৪৬২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৫)

প্রশ্ন ২৪ : ইস্তিঞ্জা বা উযূ অবস্থায় থাকার কারণে আযানের উত্তর প্রথম থেকে দেয়া সম্ভব হয়নি। এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমানে যেসব বাক্য মুয়াযযিন বলছেন তার উত্তর দেবো না ফাকে ফাকে প্রথম থেকে জওয়াব দেব? আর আযান যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কি শুধু আযানের দু'আ পড়বো না আযানের সম্পূর্ণ উত্তর দেব তারপর দু'আ পড়বো?

উত্তর : ইস্তিঞ্জা বা উযূ অবস্থায় থাকার কারণে প্রথম থেকে আযানের জওয়াব না দেয়া গেলে ইস্তিঞ্জা বা উযূ থেকে ফারেগ হওয়ার পর প্রথমে ছুটে যাওয়া বাক্যগুলো পড়বে। অতঃপর অবশিষ্ট বাক্যগুলোর জওয়াব দিবে।

প্রসঙ্গত: উযূরত ব্যক্তি উযূর মধ্যেই আযানের জওয়াব দিতে পারবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬১১, রদ্দুল মুহতার ২/৮১, আল বাহরুর রায়েক ১/৪৫২, সি'আয়াহ ২/৫৩, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮৩)

উম্মে শিহাব
গুলশান, ঢাকা।

প্রশ্ন ২৫ : (ক) সেজদা করার সময় যদি কপাল কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহলে সেজদা আদায় হবে কি না? মহিলারা সফর অবস্থায় বোরকার নেকাব পরিধান করে (যেখানে নেকাব খুললে পর্দা রক্ষা সম্ভব নয়) নামায পড়তে পারবে কি না?

(খ) হাত মোজা পরিহিত অবস্থায় মুসাফাহা করলে মুসাফাহার সুন্নাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : (ক) নামাযে মুসল্লীর পরিহিত কাপড়ের কোনও অংশ সিজদায় কপালের নিচে এসে গেলে বা ইচ্ছাকৃত দিলে নামাযে কোনও প্রকার ক্ষতি হবে না। সুতরাং মহিলাদের কপাল কাপড় ইত্যাদি দ্বারা আবৃত থাকলে বা সফরাবস্থায় পর্দার জন্য নেকাব পরে সেজদা করলে নামাযে কোনও প্রকার ক্ষতি হবে না।

উল্লেখ্য, সফরাবস্থায় গায়রে মাহরামের সম্মুখে নামায আদায় করতে হলে নেকাব পরিহিত অবস্থায় পড়া জরুরী।

(খ) হাত মোজা পরিহিত অবস্থায় মহিলাগণ পরস্পর মুসাফাহা করতে পরবে; এটা সুন্নাত পরিপন্থি কিছু নয়। তবে একান্ত মেয়েলী পরিবেশে হলে মোজা ছাড়া মুসাফাহা করা উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৫২১৪, রদ্দুল মুহতার ৬/২৫২)

সালমা খাতুন
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

প্রশ্ন ২৬ : হজ্জের মধ্যে হায়েয অবস্থায় কি কি কাজ নিষিদ্ধ? হায়েয থেকে পাক হওয়ার পর সেই কাজগুলো করার পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সমস্ত আমল করা জায়েয। কেউ হায়েযের কারণে যথাসময়ে ফরয তাওয়াফ করতে না পারলে মাসআলা জেনে পবিত্র হওয়ার পর তা করে নিবে। আর পাক হওয়ার পূর্বে কাফেলা চলে আসলে ঐ অবস্থায় ফরয তাওয়াফ করে নিবে। কিন্তু তখন গরু বা উট দ্বারা দম দেয়া ওয়াজিব হবে। আর ওয়াজিব তাওয়াফের সময় কাফেলা চলে আসলে হায়েযের কারণে তা মাফ হয়ে যাবে। (লুবাবুল মানাসেক; পৃষ্ঠা ৩৪৪-৪৫, মানাসেকে মোল্লা আলী কারী; পৃষ্ঠা ৩৪৫)

তাওহীদুর রহমান
পাইকগাছা, খুলনা।

প্রশ্ন ২৭ : আমি তিন চিল্লার জন্য খুলনা থেকে কাকরাইল আসলাম। তারপর আমার রোখ পড়েছে খুলনা, বাগের হাট ও গোপালগঞ্জ। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমি কখন থেকে কোথায় কোথায় কসর করবো? দলীসসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ৪৮ মাইল বা ৭৮ কিলোমিটার দূরত্বে যাতায়াতের পথে সর্বদা মুসাফির থাকবেন এবং কসর করবেন।

আপনার চিল্লার রোখ যদি শুধুমাত্র বাগেরহাট শহরে বা গোপালগঞ্জ শহরের মধ্যে পড়ে বা শহরের মধ্যে পনের দিন বা তার বেশি থাকার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে সে সুরতে আপনি মুকীম গণ্য হবেন।

আর যদি আপনার রোখ শহরের বাইরে পড়ে অর্থাৎ গ্রামে; কোন শহরে নয়। তাহলে আপনি মুসাফির থাকবেন।

তবে কাকরাইল থেকে দেয়া রোখ অনুযায়ী আপনাকে যদি নিজ গ্রাম বা নিজ শহরে সময় লাগানোর জন্য যেতে হয় তাহলে গ্রামে প্রবেশের সাথে সাথে আপনি মুকীম হয়ে যাবেন এবং মুকীমের মতই চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায চার রাকা'আতই আদায় করবেন।

মুসাফির অবস্থায় মুকীম ইমামের পিছে ইকতিদা করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। নিজ এলাকা হওয়ায় বা একস্থানে পনের দিন বা অধিক অবস্থানের কারণে মুকীম

হওয়ার পর যদি সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা বা অন্য কোনও এলাকায় রোখ হয় যার দূরত্ব আপনার মুকীম হওয়ার স্থান থেকে ৭৮ কিলোমিটারের কম তাহলে আপনি মুকীম অবস্থাতেই থাকবেন এবং পুরা নামায পড়বেন। আর যদি ৭৮ কিলোমিটার দূরত্বে রোখ হয় তাহলে পুনরায় মুসাফির হয়ে যাবেন। আর যদি এমন জায়গায় রোখ পড়ে যেখানে যেতে নিজের গ্রাম বা শহরের উপর দিয়ে যেতে হয় তাহলে নিজ গ্রাম বা শহর অতিক্রম করার সময় স্বল্প সময়ের যাত্রা বিরতিতেও আপনি মুকীম হয়ে যাবেন। পরবর্তীতে মুসাফির হওয়ার জন্য সেখান থেকে ৭৮ কিলোমিটার দূরত্ব হওয়া আবশ্যক হবে। তবে যদি নিজের গ্রাম বা শহরে গাড়ী দাঁড়ানোর কোন স্টপেজ না থাকে তাহলে মুসাফির হিসাবে বহাল থাকবেন। (সূরা নিসা- ১০১, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১০৬৭, হেদায়া ১/১৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৯, রদ্দুল মুহতার ২/১২১, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/৮০, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/৪৬৮)

মুহাম্মদ আব্দুল হাননান
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তিকে নিসাব হতে কিছু পরিমাণ কম যাকাত দেওয়া হলো। কিন্তু সে যাকাত গ্রহণ করে অন্যকে দান করে দিল কিংবা নিজের এমন কোনো প্রয়োজনে ব্যয় করল যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এমন ব্যক্তিকে কি আবার যাকাত দেওয়া যাবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির নিকট দান করার পর প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে তাকে পুনরায় যাকাত দেওয়া যাবে। আর যদি সে যাকাতের টাকা দিয়ে এমন কিছু ক্রয় করে যা তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং এগুলোর মূল্য ও তার অন্যান্য অতিরিক্ত সম্পদ মিলিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে তাকে দ্বিতীয় বার যাকাত দেওয়া যাবে না। যদিও তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। আর যদি এই পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে আবার যাকাত দেওয়া যাবে।– রদ্দুল মুহতার ৩/২৮৪, আলবাহরুর রায়েক ২/৪১৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/২১৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৮১।

লিয়াকত আলী খান
মুহাম্মদপুর, মাগুরা।

প্রশ্ন : আমি মীরাস সূত্রে ৫ কাঠা জমির মালিক হয়েছি। জমিটি আমি ৯ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি। চুক্তি হয়েছিল, পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করবে। কিন্তু চার মাসে ৬ লক্ষ টাকা পরিশোধের পর বাকী টাকা এখনো পরিশোধ করে নি। এক বছরেরও বেশি সময় দিচ্ছি-দিব বলে পার করে দেয়। এখন জিজ্ঞাসার বিষয় হলো, আমাকে উক্ত বকেয়া ৩ লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি না? দিলে কখন আদায় করব? উসূল হওয়ার পর বিগত সময়ের যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : উক্ত জমি ক্রেতার নিকট আপনার প্রাপ্ত বকেয়া তিন লক্ষ টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে বর্তমানেই তা আদায় করতে হবে না; বরং যখন টাকা আপনার মালিকানায় আসবে তখন আদায় করতে হবে এবং উসূল হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ৩/২৩৬, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭১৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৯৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৯০।

মু'আমালাত

মাওলানা আব্দুল মালেক
মুহাম্মদপুর,ঢাকা।

প্রশ্ন ২৮ : জনৈক ব্যক্তি মসজিদের পাশে কিছু জমি মকতব/মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করে। পরবর্তীতে মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য ওয়াকফকৃত মাদরাসার জমির পাশে কিছু জমি ক্রয় করা হয় এবং উক্ত জমির পাশে মসজিদ কর্তৃপক্ষ মাদরাসার জন্য কিছু জমি ক্রয় করে। বর্তমানে জমিটির অবস্থান হল,

মসজিদ/ওয়াকফকৃত মকতব/মাদরাসার জমি/ক্রয়কৃত মসজিদের জমি ক্রয়কৃত মাদরাসার জমি।

এখন প্রশ্ন হলো, **(ক)** মাঝের ওয়াকফকৃত মাদরাসার জায়গাটি মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করে পরবর্তীতে ক্রয়কৃত মসজিদের জমি থেকে সে পরিমাণ জমি সর্বশেষে মাদরাসার জমির সাথে মিলিয়ে দিয়ে পরিবর্তন করে নেয়া জায়েয হবে কি না?

(খ) মানুষ মসজিদে সাধারণভাবে যে দান করে থাকে তা দিয়ে মসজিদের বাথরুম ইত্যাদি বানানো যাবে কিনা?

উত্তর : (ক) প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে যদি বর্তমান মসজিদ মুসল্লিদের জন্য সংকীর্ণ প্রমাণিত হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী মাদরাসার জমিতে মসজিদ সম্প্রসারণের পর মাদরাসার জমি ও ঘর ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়ার শর্তে মকতব/মাদরাসার জমি মসজিদের সাথে একীভূত করা যাবে।

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. বলেন, মসজিদের পার্শ্ববর্তী জমি অন্য উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত হলেও মসজিদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিনিময় দিয়ে তা গ্রহণ করা যাবে। কেননা মসজিদ আল্লাহর আর ওয়াকফও আল্লাহর জন্য। আর পরবর্তীতে ক্রয়কৃত মসজিদের জমি যেহেতু এখনও মসজিদে শরঈর অন্তর্ভূক্ত হয়নি। তাই মালিকের অনুমতিক্রমে তা-ও সর্বশেষ মাদরাসার জমির সাথে একীভূত করা যাবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান অবস্থায় বহাল রেখেই যদি মসজিদ মাদরাসার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তাহলে সেটাই করা বাঞ্ছনীয়।

وتؤخذ ارض بجنب مسجد ضاق علي الناس بالقيمة كرها قال ابن عابدين: (وتؤخذ ارض) "في الفتح ولو ضاق المسجد وبجنه ارض وقف عليه اوحانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه أهـ وتقييده بقوله:"وقف عليه" أي علي المسجد يفيد أنه لوكانت وقفا علي غيره لم يجز لكن حواز أخذ المملوكة كرها يفيد الجواز بالأولي لأن المسجد لله تعالي والوقف كذالك

(রদ্দুল মুহতার ৬/৫৮১, আল বাহরুর রায়েক ৫/৪৮২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৫৬)

(খ) কোনও খাত নির্দিষ্ট করা ব্যতিরেকেই সাধারণভাবে মসজিদে যে অর্থ দান করা হয় তা দিয়ে মসজিদের বাথরুম ইত্যাদি বানানো যাবে। প্রসঙ্গত, নিদিষ্ট কোন খাতের জন্য গৃহিত অর্থ সেই খাতেই ব্যয় করা আবশ্যক। অন্য কোনও খাতে ব্যয় করতে হলে সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে করতে হবে।

(মুনতাখাবে নিযামুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ১৬৪, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৬৬৩, ইমদাদুল মুফতীন ২/২৫৮)

আব্দুর রব
তিতাস, কুমিল্লা।

প্রশ্ন ২৯ : দোকান বা বাসাবাড়ি ভাড়ার সময় ভাড়া গ্রহণকারী থেকে মালিক কর্তৃক যে এ্যাডভান্স নেয়া হয় সেটার হুকুম কি?

উল্লেখ্য, বাড়ী বা দোকান ভাড়ার ক্ষেত্রে উক্ত এ্যাডভান্সের উদ্দেশ্য হবে বাসাবাড়ী বা দোকানে ভাড়াটিয়ার অবহেলাজনিত কারণে কোন ক্ষতি হলে সেটার ক্ষতিপূরণ নেয়া। অন্যথায় বাড়ি বা দোকান ছেড়ে দেয়ার সময় উক্ত টাকা ফেরত দেয়া হবে।

উত্তর : প্রচলিত অর্থে এ্যাডভান্সের নামে মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে যে লেনদেন

হয় তা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর। ব্যাপকতার কারণে এর অবকাশ আছে বটে। কিন্তু আপত্তিমুক্ত পন্থাই গ্রহণ করা উচিত।

এ্যাডভান্সের আপত্তিমুক্ত সুরত : একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়ার চুক্তি করবে এবং মালিক শুরুতেই ভাড়াটিয়া থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অগ্রিম নিয়ে নিবে। যা পরবর্তীতে প্রতিমাসের ভাড়ার অংশ হিসেবে সমন্বয় করতে থাকবে। বা মেয়াদের শেষ এক দু' মাসের অগ্রিম ভাড়া হিসাবে গণ্য করবে। সেক্ষেত্রে মালিক উক্ত অর্থের পূর্ণ মালিকানা লাভ করবে। আর কোনও কারণে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা না গেলে ভাড়াটিয়াকে অবশিষ্ট মেয়াদের ভাড়ার টাকা ফেরত দিবে। (সূরা নিসা- ২৯, আল মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুআইতিয়্যাহ ২২/১৭৮, রদ্দুল মুহতার ৯/১৭ রশীদিয়া, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ৩/৪০৫, ফিকহী মাকালাত ১/২১৭)

প্রশ্ন ৩০ : আমাদের এলাকায় কাঁকড়ার ব্যবসা ব্যাপক হারে চালু রয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, কাঁকড়া এবং যে সকল প্রাণী মুসলমানদের জন্য খাওয়া হারাম সেগুলোর ব্যবসার হুকুম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : সামুদ্রিক বা পানিতে বাসকারী প্রাণীর মধ্য হতে শুধুমাত্র মাছ খাওয়া হালাল। সুতরাং সর্বাবস্থায় এর বেচা-কেনাও হালাল। এছাড়া অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া হালাল নয় এবং সেগুলো খাওয়ার জন্য সরবরাহ করাও জায়েয নয়। এর দ্বারা উপার্জিত অর্থও হালাল হবে না। যদিও কোনও অমুসলিমের খাওয়ার জন্যই সরবরাহ করা হোক না কেন।

তবে যে সমস্ত প্রাণীর চামড়া, দেহ বা হাঁড় দ্বারা বৈধভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব। সেগুলো ঐসব কাজের জন্য বিক্রি করাও জায়েয আছে। সে হিসাবে কাঁকড়া, ব্যাঙ, কচ্ছপ ইত্যাদি যদি খাওয়া ছাড়া অন্য কোন বৈধ কাজ যেমন ঔষধপত্র তৈরীর কাজ বা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য সার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার ব্যাপক হয়ে যায়, আর ঐ কাজের জন্য কেউ ক্রয় করে তাহলেই কেবল তার নিকট বিক্রয় বৈধ হবে অন্যথায় নয়। কিন্তু বাস্তবে এমনটি কোথাও শোনা যাচ্ছে না।

এছাড়া স্থলে যত পশু-পাখি আছে সেগুলোর ব্যাপারে হুকুম হলো, খাওয়া হালাল হলে খাওয়ার জন্য সরবরাহ করা জায়েয। আর যদি খাওয়া হালাল না হয়, তাহলে খাওয়ার জন্য সরবরাহ করা নাজায়েয ও হারাম। অন্য কোনও বৈধ ব্যবহারের জন্য হলে সরবরাহ করা যাবে। (সূরা আ'রাফ- ১৫৭, নসবুর রায়াহ ৪/৪৯০, রদ্দুল মুহতার ৫/৬৮, আল বাহরুর রায়েক ৬/১২৯, তাতার খানিয়া ৮/৩৩৮, ফাতহুল কদীর ৬/৫৭)

মুফতী মাসউদুর রহমান
সওতুল হেরা মাদ্রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

প্রশ্ন ৩১ : গ্রামের কোনও কোনও অঞ্চলে মসজিদ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর মসজিদের পক্ষ থেকে মাহফিলের ইন্তেজাম করে থাকে। এ সময় মঞ্চের এক পার্শ্বে মসজিদের পুরাতন কুরআন শরীফসমূহ ২০/৩০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এত অল্পমূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, মাহফিলে আগত মুসলমান ভাইয়েরা যাতে কুরআনে কারীম দানে বেশি শরীক হতে পারে। বিক্রয়কালে মসজিদ কর্তৃপক্ষের নিয়ত থাকে ক্রেতাগণ এই মসজিদেই কুরআনগুলো দান করবে। এবং ক্রেতাগণও এটা জানেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো, মসজিদের কুরআন বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না? জায়েয থাকলে এই পদ্ধতিতে জায়েয আছে কি না? এই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয থাক বা না থাক উভয় অবস্থায় কেউ যদি কুরআন শরীফ ক্রয়ের পর ঐ মসজিদে দান না করে তা নিয়ে বাড়ীতে চলে যায় তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর : লোকজন মসজিদে যে সমস্ত কুরআন শরীফ দেয়, তা সাধারণতঃ মসজিদের মুসল্লীদের পড়ার জন্য ওয়াকফ করে থাকে। আর ওয়াকফকৃত জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। আর ওয়াকফকৃত জিনিষ বিক্রয় করলে তা ইসলামী শরীয়তে বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে কুরআন শরীফ বিক্রয় করা, ক্রয় করা এবং ক্রেতার জন্য উক্ত কুরআন শরীফ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া কোনটাই জায়েয হবে না। এর পরও কেউ যদি বাড়ীতে নিয়ে যায়, তাহলে উক্ত মসজিদে তা ফেরৎ দিতে হবে। অন্যথায় গুনাহগার হবে। আর ক্রেতারা তাদের টাকা ফেরৎ পাবে। আর কুরআন শরীফ মসজিদেই থাকবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৭৩৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬৩৩, রদ্দুল মুহতার ৫/৫৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৬৩, ফাতহুল কদীর ৫/৪৩২, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/৭৭)

মাওলানা রুহুল আমীন
মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।

প্রশ্ন ৩২ : আমার এক বন্ধু জন্মের তিন মাস পর তার মা অসুস্থ হওয়ার কারণে নিজ নানীর দুধ পান করে। এখন সে তার আপন মামাতো বোনকে বিয়ে করতে চায়। একথা শুনে এলাকার কিছু লোক বলছে এদের বিবাহ সহীহ হবে না আর কিছু লোক বলছে বিবাহ সহীহ হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কাদের বক্তব্য সঠিক?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার বন্ধু তার মামাতো বোনকে বিয়ে করতে পারবে না। নানীর দুধ পান করার কারণে তার মামা তার দুধভাই হয়ে গেছে। ফলে মামাতো বোন তার দুধ সম্পর্কীয় ভাতিজী। আপন ভাতিজীকে যেমন বিয়ে করা বৈধ নয় তেমনি দুধ সম্পর্কীয় ভাতিজীকেও বিয়ে করা বৈধ নয়। অতএব, এলাকার যারা এই বিয়েকে নাজায়েয বলেছে, তাদের কথাই ঠিক। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১০০, বাদায়িউস সানায়ে ৩/৩৯৬)

প্রশ্ন ৩৩ : জনৈক ব্যক্তির দুধ বোন অপর এক মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত ব্যক্তি ঐ মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে দুধপান সম্পর্কীয় আত্মীয়তা অনেক ক্ষেত্রে বংশীয় আত্মীয়তার ন্যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে উক্ত ব্যক্তির দুধ বোন যদি কোন মেয়েকে দুধ পান করিয়ে থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির জন্য ঐ মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ হবে না। ঐ মেয়েটি তার দুধ বোনের নিজের মেয়ের মত হয়ে গেছে। (সূরা নিসা- ২৩, রদ্দুল মুহতার ৩/২১৩)

প্রশ্ন ৩৪ : যদি কোনও পুরুষ বিবাহের সময় মোহর হিসেবে মৌখিকভাবে একটি সংখ্যা নির্ধারণ করে। তারপর কাবিননামায় আরেকটি সংখ্যা লিখে। তাহলে কোন সংখ্যাটি মোহর হিসাবে গণ্য হবে?

উল্লেখ্য, কাবিননামার ধারাসমূহ লেখার শেষে স্বামীর স্বাক্ষর রয়েছে।

উত্তর : বিবাহের আকদের মজলিসে মৌখিক ঈজাব-কবুলের সময় যে মোহরের কথা উল্লেখ করা হয় শরীয়ত মতে সেটাই মোহর এবং সেটাই আদায় করা আবশ্যক হবে। অবশ্য পরবর্তীতে স্বামী ইচ্ছা করলে বাড়িয়ে দিতে পারে। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩৯/১৫৩, রদ্দুল মুহতার ৩/১১১, ১৬১)

বিবিধ

উম্মে শিহাব
মিরপুর, ঢাকা।

প্রশ্ন ৩৫ : মহিলারা হিজড়াদের সাথে কি গায়রে মাহরাম পুরুষের মত পর্দা করবে?

উত্তর : পর্দার ব্যাপারে হিজড়াদের শরয়ী বিধান : যে সমস্ত হিজড়াদের শারীরিক গঠনে পুরুষ-সাদৃশ্যতা রয়েছে, (যেমন উভয় লিঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গ সচল হয় বা দাড়ী-মোচ গজায়) তাহলে শরীয়ত তাকে পুরুষ গণ্য করবে। সুতরাং গায়রে মাহরাম মহিলাগণ তার সাথে পর্দা রক্ষা করে চলবে। আর যে সমস্ত হিজড়াদের শারীরিক গঠন মহিলা-সাদৃশ হয় (যেমন উভয় লিঙ্গের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ সচল বা অন্য সাধারণ মহিলাদের মত স্তনযুগল বড় হয়) তাহলে শরীয়ত তাকে মহিলা গণ্য করবে। সুতরাং তার সাথে অন্য মহিলাদের পর্দা করতে হবে না। বরং সে গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে পর্দা রক্ষা করে চলবে।

আর যদি পুরুষ/মহিলার কোনও আলামতকে প্রধান্য দেয়া না যায়, তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল নারী-পুরুষ উভয়েই সতর্কতামূলক তার সাথে পর্দা করে চলবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সাধারণত হিজড়ারা মহিলাদের বেশ-ভুশা ধারণ করে থাকে পুরুষ-সাদৃশ হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং কোনও প্রকার পার্থক্য ব্যতিতই সকল হিজড়াদের সাথে পর্দা রক্ষা করা জরুরী। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১৮১, বাদায়িউস সানায়ে ৬/৪১৮, ৪১৯)

প্রশ্ন ৩৬ : (ক) দিন তারিখ নির্ধারণ না করে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজনরা একত্রিত হয়ে ঈসালে সওয়াবের জন্য মাসনূন কোনও আমল করা বা খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা?

(খ) ঈসালে সওয়াবের জন্য উলামায়ে কেরাম বা মাদরাসার ছাত্রদেরকে হাদিয়া-তোহফা দেয়া বা তাদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো যাবে কিনা?

উত্তর : (ক) দিন তারিখ ও সময় নির্ধারণ না করে যে কোনও সময় যে কোনও সওয়াবের কাজ (যেমন, নফল নামায নফল রোযা, দান-সদকাহ, কুরআন তিলাওয়াত ও মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে বা গরীব-মিসকীন-খাওয়ানো) করে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছে দেয়া শরীয়ত অনুমোদিত কাজ। শর্ত হলো, খানা খাওয়ানোটা কোনও খতম বা দু'আর সাথে সম্পৃক্ত না হতে হবে। আর প্রথাগত কোনও তারিখের (যেমন তিনদিনা, চল্লিশা ও বার্ষিকী ইত্যাদি) পাবন্দী না করে আত্মীয়-স্বজনরা কোনও উপলক্ষে একত্রিত হয়ে কোনও মাসনূন আমল করতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের গণ্যমান্য স্বচ্ছল লোকদের নিয়ে বিবাহশাদীর ন্যায় ভোজ অনুষ্ঠানের সাথে ঈসালে সওয়াবের কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ এ জাতীয় অনুষ্ঠানে উৎসবের দিকটাই প্রধান হয়ে থাকে। আর তা হয় সামাজিক প্রথা হিসাবে। এছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোক দেখানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অথচ মুর্দাকে কেন্দ্র করে উৎসব করা, প্রথা-পালন ও লোক দেখানোর জন্য খানা খাওয়ানোর কোনটিই শরীয়ত অনুমোদিত নয়। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কোনও আমল করতে গিয়ে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এমন আপত্তিকর খাবারের অনুষ্ঠান বাদ দেয়া সম্ভব না হলে উচিত হলো আপনাদের যে আত্মীয়-স্বজন যে স্থানে আছে সে সেখানে থেকেই নিজ সামর্থ অনুযায়ী যে যখন পারে উপরোক্ত নফল আমলগুলো করে সওয়াব রেসানী করে দিবে, এটাই শরীয়ত অনুমোদিত উত্তম পন্থা এবং এতে মৃত ব্যক্তি উক্ত আমলের সওয়াব পাওয়ার অধিক আশা করা যায়।

(খ) হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমদের জন্য স্বতন্ত্র মেহমানদারীর ইন্তেজাম করা, এর সাথে যদি খতম, দু'আ ও প্রথা-পালনের কোন প্রকার শর্ত না থাকে তাহলে এটাও একটি নফল ইবাদত, যা মাইয়্যেতের সওয়াব রেসানীর জন্য করা যেতে পারে। (ই'লাউস সুনান ৮/৩৩০, ফাতহুল বারী ২/১০২, ইমদাদুল আহকাম ১/২০৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/৬৫)

মুহাম্মদ আহমাদুল্লাহ নুমান
চাটখিল, নোয়াখালী।

প্রশ্ন ৩৭ : মান্নত করার পর মনে হল যে মসজিদের উদ্দেশ্যে মান্নত করা সহীহ না। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত মান্নতের টাকা কোন মাদরাসায় বা মিসকিন কে প্রদান করে আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের উদ্দেশ্যে মান্নত করার দ্বারা তার নিয়ত যদি হয় উক্ত টাকা মসজিদে দান করে দিবে তাহলে এ মান্নত আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে নেক কাজের ওয়াদা হিসেবে মান্নত পরিমাণ টাকা মসজিদে দান করে দেয়া ভালো। আর চাইলে মাদরাসায়ও দিয়ে দিতে পারে। এতেও তার ওয়াদা পূরণ হয়ে যাবে। আর যদি নিয়ত থাকে কোন জিনিস কিনে মসজিদে ওয়াকফ করা তাহলে মান্নত সহীহ হবে এবং আদায় করাও জরুরী। (রদ্দুলমুহতার ৩/৭৩৫, ইমদাদুল আহকাম ৩/২৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১/৫৭২)

রফীকুল ইসলাম
মাসনা, যশোর।

প্রশ্ন ৩৮ : বর্তমানে সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ড (আই.সি.সি) এর অধিনে ক্রিকেট খেলা পরিচালিত হয়। উক্ত খেলায় বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলগুলো সরকারী খরচে এবং সরকারের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণ করে থাকে। সরকার তাদেরকে বেতন দেয়। কখনও ভালো খেললে পুরস্কারও দেয়। অতঃপর আই.সি.সি. কর্তৃক বিজয়ী দলকে পুরস্কৃত করে। আই.সি.সি. নামক সংস্থাটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর আর্থিক সহায়তায় চলে। আবার কোনও কোনও সময় বিভিন্ন কোম্পানি বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে খেলার আয়োজন করে এবং উক্ত খেলায় বিভিন্ন দেশের ভালো খেলোয়াড়দেরকে কিনে নেয়া হয়। খেলা শেষে বিজয়ী দলকে পুরস্কৃত করা হয় এবং উক্ত পুরস্কার আয়োজক কোম্পানী বা ব্যক্তির প্রাপ্য হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে,

(ক) কোনও খেলোয়াড় বা দল যদি নামাযের পাবন্দ হয়ে সতর ঢেকে সরকারী বেতনভুক্ত হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে তাহলে তার জন্য খেলা এবং বেতন নেয়া জায়েয হবে কি না?

(খ) পুরস্কারটি দেয়া হচ্ছে আই.সি.সি. তথা তৃতীয় পক্ষ থেকে। অতএব উক্ত পুরস্কার দল বা সরকারের জন্য বৈধ হবে কি না?

(গ) কোম্পানী বা ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে খেলোয়াড়কে কিনে নিলে উক্ত টাকা তার জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে খেলার বৈধতার শর্তসমূহ জানতে হবে। ইসলামী শরীয়ত মতে খেলা-ধুলা জায়েয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য। (১) খেলা-ধুলা শুধুমাত্র শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য হতে হবে। যে খেলায় শরীর ও মনের উল্লেখযোগ্য সুস্থতা নাই শরীয়তে সে খেলা অনুমোদিত নয়। (২) খেলাকে স্বতন্ত্র লক্ষ্য বা পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। (৩) খেলার সঙ্গে কোনও নাজায়েয বিষয় যেমন বেপর্দেগী, উলঙ্গপনা, জুয়া ইত্যাদির সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না। (৪) খেলায় লিপ্ত হয়ে শরীয়তের কোনও হুকুম পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না।

(৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পর্দা নারীর আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতীক

মুফতী তাফাজ্জুল হুসাইন গাজীপুরী

দু'টি চিত্র লক্ষ্য করুন। প্রথমটি ইসলামের স্বর্ণযুগের। আর দ্বিতীয়টি তথাকথিত প্রগতি-যুগের।

চিত্র-১

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামল। ইসলামী খেলাফতকাল পরিধি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সে যুগের সফর আজকালের মতো এত সহজ ছিল না। পথ-ঘাটের চড়াই-উৎরাই, প্রশস্ত মরুভূমি এবং গিরিপথ অতিক্রম করা ছাড়াও গন্তব্যে পৌঁছতে ভয়ংকর সব মৃত্যুপুরী অতিক্রম করতে হত। এক মুসলিম নারী সাহায্যের আশায় দারুল খিলাফায় এসেছে সুদূর ইরাক থেকে। দুর্গম পথ অতিক্রম করতে এ মুসলিম নারীর বুক কাঁপলেও ইজ্জত আব্রুর ব্যাপারে হৃদয়ে তার সামান্যও শঙ্কা জাগেনি। সব নারীর সফর হতো তখন একেবারে নিরাপদ সফর। (আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যাহ ৩/২০৭)

চিত্র-২

পিচঢালা মসৃণ রাজপথ। যান্ত্রিক উন্নতির বিচিত্র সব সুবিধা ভোগ করে শহরের বাসিন্দারা। যাতায়াত সুবিধার জন্য অসংখ্য উড়াল সেতু তৈরি করা হয়েছে। শহর জুড়ে মেট্রোরেল চলাচলকে আরও সহজ করে দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার খুব দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি 'ভারতে'র রাজধানী এটি।

শক্তিশালী নিরাপত্তা চাদরে ঘেরা এ শহরটিতে ২০১২ এর ১৬ ডিসেম্বরে ঘটে যাওয়া এক লোমহর্ষক দুর্ঘটনা পুরো বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। চলন্ত বাসে মেডিকেল কলেজের ছাত্রী-দামিনীর শ্লীলতাহানি এবং এর পরবর্তী আচরণ সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। যদিও আজকের আলোর(!) যুগে এমন ঘটনা অহর্নিশ ঘটছে। বরং আলোর গতির সাথে দিনদিন এমন অঘটন বেড়েই চলছে।

দুই কালের পার্থক্য; একজন পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য

সমাজের অপরাধ রোধ এবং তার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাজ। তারা খুব কাছ থেকে সমাজকে প্রত্যক্ষ করেন। সমাজের ভালোমন্দ অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন মহলের চাপে সবসময় প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে না পারলেও কখনও তা প্রকাশ হয়েই যায়। ঘটনার পর অন্ধ্র প্রদেশের পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল দীনেশ বলেন, নারীদের অশালীন পোশাক ধর্ষণ প্রবণতাকে প্ররোচিত করে।

উক্তিটি সমাজকর্মী(!) এবং কথিত নারীবাদীদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রতিবাদ, সভা-সমাবেশ বহু কিছু হল। কিন্তু প্রবহমান ঘটনায় একটু দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট বুঝে আসে, জেনারেল দীনেশ যথার্থই বলেছেন। এটা তো বহু পরের একটা উক্তি। কিন্তু ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগেই আমাদেরকে এ উপলব্ধি দিয়েছে। নারীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য যে পরিবেশে যে পোশাক শালীন ইসলাম তার জন্য সেই পোশাকই নির্ধারণ করে দিয়েছে। ঘরের অভ্যন্তরে যে পোশাক চলনসই বাইরের পরিবেশে তা ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য যথার্থ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই কোন প্রয়োজনে বহির্গমনের জন্য ঢিলেঢালা বস্ত্র দ্বারা পূর্ণ শরীর ঢেকে বের হতে আদেশ করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় পুরো শরীর ঢিলেঢালা পোশাকে আবৃত করাকেই হিজাব গ্রহণ বলে।

ইসলামী শরীয়তে হিজাব বা পর্দা

বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ফকীহ মুফতী শফী রহ. আহকামুল কুরআনে (৩/৩৯৩) হিজাব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত এ বিষয়ের প্রায় সকল নুসূস বিশ্লেষণ করে অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতার ভিত্তিতে তিনি হিজাবের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন।

এক. ঘরে, চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বা আবদ্ধ স্থানে স্বাভাবিক পর্দা। এ অবস্থায় গাইরে মাহরামের সামনে বাহ্যিক বা ভিতরগত সৌন্দর্য কোন কিছুই প্রকাশ পায় না। চেহারা, হাত বা শরীরের কোন কিছু প্রকাশ পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

দুই. বোরকা বা বড় চাদর যা দ্বারা চেহারা হাতসহ পুরো শরীর আবৃত হয় এমন চাদর দ্বারা হিজাব গ্রহণ। এ পদ্ধতিতে মাথা থেকে পা পুরো শরীর কাপড় আবৃত থাকবে।

তিন. চেহারা, হাত অনাবৃত রেখে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা।

উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে মহিলাদের জন্য প্রথম প্রকারের হিজাব হলো মূল। অর্থাৎ মহিলারা বাড়ির আঙ্গিনার ভিতরেই থাকবে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

অর্থ : তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান করো। (সূরা আহযাব- ৩৩)

মনে রাখতে হবে, এ নির্দেশ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সাথে সীমাবদ্ধ নয়।

অন্য আয়াতে বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার বাইরে থেকে চাও।' (সূরা আহযাব- ৫৩)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারী হলো আওরাত (গোপন থাকার জিনিস) যখন সে বাইরে বের হয় শয়তান তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৭৩)

দ্বিতীয় স্তর

নারীরা কখনও বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে বাধ্য হয়। সে অবস্থায় তাদের জন্য বাইরে বের হওয়া বৈধ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ণ চেহারা ও হাত পা-সহ পুরো শরীর আবৃত করে তবেই বের হতে পারবে। শরীরের কোন অংশ অনাবৃত রেখে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ...

অর্থ : হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে ও আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন স্ব-স্ব চাদরগুলো নিজেদের (চেহারার) উপর (মাথা হতে) নিম্নদিকে ঝুলিয়ে নেয়। (সূরা আহযাব- ৫৯)

হিজাবের এ আয়াতে 'জিলবাব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'জিলবাব' হল এমন চাদর যা উপর থেকে নীচ সমস্ত শরীর আবৃত করতে সক্ষম।

আল্লামা ইবনে হাজম রহ. বলেন,

والجلباب فى لغة العرب التى خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غطى جميع الجسم لا بعضه.

অর্থ : যে জিলবাবের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তা হলো সেই চাদর যা সমস্ত শরীরকে আবৃত

করে। শরীরের কিছু অংশ আবৃতকারী চাদর উদ্দেশ্য নয়। আরবী ভাষায় জিলবাবের অর্থ এমনই। (মুহাল্লা ৩/২১৭)

আল্লামা ইবনে সীরীন রহ. বলেন, আমরা আবিদা সালমানিকে يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তার ওড়না দ্বারা মাথা এবং চেহারা আবৃত করলেন। শুধু বাম চোখ খোলা রেখেছিলেন।

ইমাম যাহেদ কাওসারী রহ. এ বর্ণনার সনদের ব্যাপারে বলেন, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে পাহাড়সম ভারী।

তৃতীয় স্তর

হিজাবের তৃতীয় স্তর হলো, নারীরা তাদের চেহারা এবং হাত ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখবে। হিজাবের এ পদ্ধতিটি দু'টি শর্তের সাথে অনুমোদিত। (এক) ফেতনার আশঙ্কা না থাকা। (দুই) চেহারা বা হাত খোলা রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়া। যেমন প্রচণ্ড ভীড় হওয়ার কারণে চেহারা ঢেকে রাখলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা হওয়া। তবে চিকিৎসার স্বার্থে ডাক্তারের সামনে বা সাক্ষ্য দানের জন্য বিচারকের সামনে ফেৎনার আশঙ্কা হলেও অনেক ফকীহ চেহারা খোলার অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হল, বিকল্প ব্যবস্থা না থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

অর্থ : আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, ... তারা যাতে তাদের যীনতসমূহ প্রকাশ না করে, কেবল সেই স্থানসমূহ ব্যতীত যা খোলা থাকে। (সূরা নূর- ৩১)

হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে পিছনে বসা ছিলাম। এক বেদুঈন তার সুন্দরী কন্যাকে (অনাবৃত চেহারায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বিবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে পেশ করলেন। আমি চেহারা ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথা ধরে চেহারা (অন্যদিকে) ঘুরিয়ে দিলেন। (মুসনাদে আবু ইয়ালা; হা.নং ৬৭৩১)

এ হাদীসে গ্রাম্য সাহাবী তার কন্যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ দিতে চাচ্ছিল। তাই প্রস্তাব পেশ করার সময় চেহারা খোলা রেখেছিল।

সারকথা, কুরআনে নারীদেরকে যথাসম্ভব ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া বের না হতে বলেছে। আর যদি বের হতেই হয় তাহলে জিলবাব বা বোরকা দ্বারা চেহারা এবং হাতসহ পুরো শরীর আবৃত করে বের হতে বলা হয়েছে। তবে দুই অবস্থা এর ব্যতিক্রম।

(এক) বিশেষ প্রয়োজন। যেমন ভীড় হওয়ার কারণে, সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ইত্যাদি।

(দুই) কামাই রোজগারের প্রয়োজনে কাজ করতে গিয়ে অনিচ্ছায় হঠাৎ চেহারা আবরণমুক্ত হয়ে পড়লে কোনও গুনাহ হবে না। এ অবস্থায় পুরুষদের কর্তব্য তাদের দৃষ্টি অবনত রাখা।

পর্দা শুধু বস্ত্রাবৃত হওয়ার নাম নয়

কাপড় দ্বারা নিজের শরীরকে আবৃত করা আর শরয়ী পর্দা পালন করা এক কথা নয়। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন, দশটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হলে তখন প্রকৃত হিজাব পালন হবে। ১) শরীরের পর্দা ২) মনের পর্দা ৩) চেহারার পর্দা ৪) কণ্ঠস্বরের পর্দা ৫) নামাযের পর্দা ৬) গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে পর্দা ৭) দৃষ্টির পর্দা ৮) বিপদ কালীন পর্দা ৯) ঘরের ভিতরের পর্দা ১০) শরীরের বাইরের পর্দা।

(ক) শরীরের পর্দা : শরীরের সৌন্দর্য ঢেকে রাখার নিমিত্তে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে নবী! আপনি নিজ পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের (ওড়নার) কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, (তারা আযাদ-দীনদার) ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব- ৫৯)

(খ) মনের পর্দা : মুসলিম নারীদের মনের পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, (অর্থ) 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নবীর স্ত্রীগণের নিকট কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (সুরা আহযাব-৫৯)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে এখনও আমি দেখিনি, (তারা অতি সত্তর কিয়ামতের পূর্বে আসবে) এক শ্রেণী ঐ সকল লোক, যাদের হাতে ষাড়ের লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে (অন্যায়ভাবে) প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐ সকল নারী যারা বস্ত্রাবৃত থেকেও নগ্ন থাকবে। অর্থ্যাৎ এমন পাতলা বা শর্ট জামা পরবে যা পরার পরও শরীর দেখা যাবে। তারা (পর পুরুষকে) আকর্ষণকারিণী এবং নিজেরা ভিন্ন পুরুষদের প্রতি লালায়িত হবে। তাদের চুলের খোপা হবে বুখতী উটের হেলানো কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না। অথচ জান্নাতের খুশবু এত এত দূর (সত্তর বছরের দুরত্ব) থেকে পাওয়া যায়। (মুসলিম শরীফ; হা.নং ৫৪১৯)

(গ) চেহারার পর্দা : চেহারার পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা যেন তাদের মাথায় পরা ওড়নাকে (চেহারাসহ) তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশের উপর জড়িয়ে দেয়। (সূরা নুর- ৩১) এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম শ্রেণীর মুহাজির নারীদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তা'আলা যখন এই আয়াত (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) নাযিল করলেন, তখন তারা নিজেদের চাদর ছিড়ে (ওড়না বানিয়ে) তা দ্বারা নিজেদেরকে (চেহারাসহ) ঢেকে নিলেন। (বুখারী শরীফ; হা.নং ২৪৭৬)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, 'বিখুমুরিহিন্না' এর অর্থ হল তারা নিজেদের (সীনা আবৃতসহ) মুখমণ্ডল আবৃত করেন। (ফতহুল বারী ৩৪৭)

(ঘ) কণ্ঠস্বরের পর্দা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী সহধর্মিণীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় স্বরে (ভঙ্গিতে) কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করবে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা স্বাভাবিকভাবে (নিরস ভাষায়) কথা বলবে। (সূরা আহযাব- ৩২)

(ঙ) নামাযের পর্দা : নামাযে নারীদের চেহারা এবং হাতের পাঞ্জা ও পায়ের পাতা ছাড়া আপাদমস্তক ঢেকে রাখা ফরয। এমনকি চুলের কিছু অংশ খোলা থাকলেও নামায হবে না।

(চ) গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে পর্দা : মাহরাম পুরুষদের সাথে পর্দার নীতিমালা সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, 'হে নবী! ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী, যৌন

কামনামুক্ত পুরুষ এবং ঐ বালক যারা নারীদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতিত কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে'। (সূরা নূর- ৩১)

উক্ত আয়াতে মাহরাম ১৪ শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ব্যতিত সকল পুরুষের সাথে পূর্ণ পর্দা করা ফরয।

(ছ) দৃষ্টির পর্দা : দৃষ্টির পর্দা সম্পর্কে কুরআনের সূরা নূরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে। নিশ্চই তারা যা করে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। হে নবী! ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে, এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (সূরা নূর- ৩০, ৩১)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় পর্দা নর-নারী উভয়ের জন্যই জরুরী। প্রত্যেকে যার যার নির্দিষ্ট সীমানায় পর্দা মেনে চলবে। অন্য হাদীসে হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা পর-নারীদের সম্মুখে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। এ কথা শুনে এক আনসারী সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য ভয়াবহ ব্যাপার)। (সহীহ বুখারী; খণ্ড -৯ পৃ: ২৪২)

অন্যত্র মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন দৃষ্টিসমূহের খিয়ানত (অপাত্রে নযর) এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে। (সূরা মুমিন- ১৯)

হাদীস শরীফে আছে, হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হঠাৎ-দৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন তোমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৪৮১)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে ঘোষণা করেন, দু-চোখের যিনা হলো অপাত্রে দৃষ্টি করা। জবানের যিনা হল (অবৈধ প্রেমের) কথা বলা। আর অন্তর মন্দ কাজের আশা ও বাসনা রাখে (তাও যিনা) আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত করে অথবা তা থেকে বিরত থাকে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৭২)

(জ) বিপদকালীন পর্দা : বিপদাপদে পর্দার বিধান মওকুফ হয়ে যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন পরিপূর্ণ হিজাব ব্যবহার জরুরী, অস্বাভাবিক অবস্থায়ও তদ্রূপ হিজাব রক্ষা করা জরুরী। হযরত উম্মে খাল্লাদ নাম্নী একজন সাহাবিয়্যার পুত্র-সন্তান কোন এক জিহাদে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরীক হয়ে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান। তার সংবাদ জানার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এই চরম দুঃসংবাদ ও বিপদের মুখেও উক্ত মহিলা পর্দা রক্ষা করতে ভুল করেননি। এমন সংকটাপূর্ণ মুহূর্তে তার পর্দা পালন দেখে জনৈক সাহাবী বিস্ময়াভিভূত হয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে এই মহীয়সী নারী বললেন, আমি আমার পুত্র হারিয়ে এক বিপদে পড়েছি। এখন হিজাব ছেড়ে দিয়ে আরেক বিপদে পড়ব? (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৪৮০)

তাই নারীদেরকে বিপদের সময়ও ধৈর্য ধরে পর্দা পালন করতে হবে। কারো বিয়োগ-ব্যথায় কান্নার স্বর উঁচু করবে না। কারণ মহিলাদের আওয়াজও পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

(ঝ) ঘরের ভিতরের পর্দা : মুমিন নারীদের জন্য আপন ঘরের ভিতরেও নিজেকে পর্দায় রাখা অপরিহার্য। যেমনিভাবে তারা পর পুরুষের নজর থেকে আঁড়াল হয়ে ঘরে থাকবে তেমনিভাবে নিজেদের দৃষ্টিও ঘর থেকে পর-পুরুষের প্রতি দেয়া থেকে বিরত থাকবে। নিজ ঘরে ভিন্ন পুরুষের ছবি, ছায়াছবি, উপন্যাস, অশ্লীল ছবি, বইপত্র ইত্যাদি দেখবে না, পড়বে না। অপরিচিত মোবাইল নম্বরে কথা বলবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণকে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে তা'লীম দিয়েছেন। হযরত উম্মে সালমা রাযি. বলেন, আমি একবার হযরত মাইমূনা রাযি. এর সাথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. (অন্ধ সাহাবী) সেখানে আসতে লাগলেন। এটি ছিল পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরের ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা পর্দার ভিতরে চলে যাও। আমরা বললাম, তিনি কি অন্ধ নন যে, আমাদেরকে দেখতে পাবেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ধমকের স্বরে) বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাবে না? (তারপর তারা পর্দায় চলে গেলেন)। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৭৭৯)

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় নারীরা বিনা প্রয়োজনে পর পুরুষের দিকে তাকাবে না। যেমনিভাবে পুরুষেরা ভিন্ন নারীর দিকে তাকাবে না।

(ঞ) ঘরের বাইরের পর্দা : নবী-প্রেমিক নারীদেরকে ঘরের বাইরে একান্ত প্রয়োজনে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও পর্দার বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্য রাখা জরুরী। কারণ মা-বোনদের জন্য আসল পর্দাই হল ঘরের ভেতর অবস্থান করা। শরীয়ত-সম্মত একান্ত ওযর যেমন, তার ভরণ-পোষণের জন্য কেউ নেই তাহলে জীবিকা অর্জনের জন্য বা ইসলামী আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজনে, রোগের চিকিৎসার জন্য, আপন পিতা-মাতার সাক্ষাতের জন্য বা ঘরে টয়লেট-বাথরুমের ব্যবস্থা না থাকলে জরুরত সারতে বাইরে যেতে পারবে। হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত সাওদা রাযি. সম্পর্কে রাত্রে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতির কথা উল্লেখ রয়েছে।

সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে আদেশ করেছেন- তারা যখন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন যেন জিলবাব (বড় ওড়না) মাথার উপর দিয়ে টেনে নিজেদের মুখমণ্ডল আবৃত করে। আর চলাফেরা করার জন্য শুধু এক চোখ আবরণমুক্ত রাখে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৪)।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারী হল আওরাত (পর্দায় থাকার পাত্র)। যখন সে ঘর থেকে বের হয় (লোকালয়ে আসে), শয়তান তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (পুরুষের নজরে আকর্ষণীয় করে তোলে যাতে সে পাপে লিপ্ত হয়)। (সুনানে তিরমিযী হা.নং ১১৭৩)

অন্যত্র রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন নারী নিজের মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর করবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৪১)

সুতরাং মুসলিম নারীগণ একান্ত প্রয়োজনে বাইরে বের হলে ঢিলেঢালা

মোটা বোরকা পরবে। চেহারা ঢাকবে, হাত মোজা, পা মোজা ব্যবহার করবে। নযর হেফাযত করবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। নিজের সৌন্দর্য দেখাবে না, সজোরে কদম মারবে না। পুরুষের মত পোশাক পরবে না। বিজাতীয়দের পোশাক পরার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ নারীদের ব্যবহারের কাপড়ে পর্যন্ত পর্দা রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই সর্বদা নিজেকে খোদার বাঁদী মনে করে মনের স্বাধীনতাকে শরীয়তের নিয়ন্ত্রণাধীন লাগামে পরাধীন করতে হবে। তাহলেই অক্ষুণ্ন থাকবে মাতৃজাতির সতীত্ব।

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ১০ প্রকার পর্দার সমন্বয়কে শরয়ী পর্দা বলা হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিষয়কে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে পালন করলেই ইসলামী পর্দা হবে। শুধু বোরকা পরিধান করার নাম পর্দা নয়; বোরকা হল পর্দার অন্যতম সহায়ক। সুতরাং কাউকে বোরকা পরে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সে আসলে পর্দা করেনি; পর্দার বাহানা করেছে মাত্র। মনে রাখতে হবে, পর্দা নারীর উন্নতির প্রতিবন্ধক নয়; পর্দা আভিজাত্য ও মর্যাদার রক্ষক। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনের বিরুদ্ধে পর্দা হল নারীত্বের রক্ষাকবচ। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইতর প্রাণীর মধ্যে যেমন পানাহার, যৌনাচারের চাহিদা দিয়েছেন তদ্রূপ সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মধ্যেও এই চাহিদা দিয়েছেন। এখন মানুষ যদি শরীয়তের আওতাধীন হয়ে পানাহার আর যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে তাহলে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ আর ইতর প্রাণী কুকুরের মধ্যে তফাৎ থাকল কোথায়? অথচ আভিজাত্য আর সভ্যতার দাবী হল, মানুষ সৎ ও পবিত্র চরিত্র লালন করবে। প্রাণীর মত ভোগ আর যৌন তাড়নায় খেই হারাবে না।

পরিতাপের বিষয় হল, আজ আধুনিকতার ধোঁয়া তুলে নারী জাতিকে শরয়ী পর্দার নিরাপদ ছায়া থেকে টেনে অশ্লীলতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করা হচ্ছে। লুণ্ঠিত হচ্ছে তাদের ইজ্জত-আব্রু। ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছে মাতৃজাতি।

ধিক! এই ফ্যাশনবাদী প্রগতিশীল সমাজের প্রতি। বস্তুতঃ ইসলামই নারীকে মানুষের কাতারে এনে ওয়ারিসী হক, সম্পদের অধিকার এবং যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে ন্যায়সঙ্গত ও পর্যাপ্ত অধিকার দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে, যা বিশ্বের কোন ধর্ম ও জাতি তা দিতে পারেনি। এর পরও যদি মুসলিম নারীরা শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহর বিধান পর্দা পালন না করে তাহলে তা হবে চরম দুঃখজনক।

অতএব জগৎটাকে নৈতিকতাপূর্ণ, পবিত্র, রুচিশীল, সভ্য, আদর্শমণ্ডিত ও শান্তিময় করতে হলে ইসলামের মহান নির্দেশ নারী জাতির আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতীক পর্দা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষক, মদীনাতুল উলূম মাদরাসা,
শিকদার মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

(১০ পৃষ্ঠার পর)

তবে এক্ষেত্রে গৃহের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ব্যতীত অন্যান্য আসবাব সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্যাদি, নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, ঘর প্রভৃতির মূল্যও ধর্তব্য হবে।

রোযা রাখা ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কেউ যদি রোযা না রাখে কিংবা না রাখতে পারে তার উপরও সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

সদকাতুল ফিতর নিজের পক্ষ থেকে এবং পিতা হলে শিশু সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব। সাবালক সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, অধীনস্ত কর্মচারী এবং মাতা-পিতা প্রমুখের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে সাবালক সন্তান উন্মাদ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি হলে পিতার জন্য তার পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব।

একান্নভুক্ত পরিবার হলে সাবালক সন্তান, মাতা-পিতা এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

ওয়াজিব না হলেও সঙ্গতি থাকলে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব এবং অনেক পূণ্যের কাজ।

সদকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে ১ কেজি ৬৩৬ গ্রাম গম, আটা, ময়দা, ছাতু বা কিংবা সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করতে হবে। কিশমিশ, যব বা খেজুর দিতে চাইলে ৩ কেজি ২৭২ গ্রাম বা সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করতে হবে।

ধান, চাল, বুট, কলাই এবং মটর ইত্যাদি দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করতে চাইলে উপরোক্ত গম বা যবের মূল্যে প্রাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদান করতে হবে।

সদকাতুল ফিতর আদায়ে সরাসরি খাদ্যশস্যের তুলনায় তার মূল্য প্রদান করা উত্তম।

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম। তবে নামাযের পরে কিংবা রমযানের মধ্যেও প্রদান করা জায়েয আছে।

যেসব ব্যক্তিদেরকে যাকাত দেয়া যায় তাদেরকে সদকাতুল ফিতরও প্রদান করা যায়।

একজনের সদকাতুল ফিতর একজনকে বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রদান করা জায়েয আছে। তেমনিভাবে কয়েকজনের সদকাতুল ফিতরও একজনকে প্রদান করা জায়েয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সে এর মাধ্যমে যাকাত বা সদকাতুল ফিতর প্রদানের উপযুক্ত না হয়ে যায়। অধিকতর উত্তম হলো, একজন ব্যক্তিকে এ পরিমাণ সদকাতুল ফিতর প্রদান করা যাতে সে ছোটো খাটো প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কিংবা পরিবার পরিজন নিয়ে দু তিন বেলা আহার গ্রহণ করতে পারে।– আদদুররুল মুখতার ৩/৩২২, ৩২৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৪/৩৭৫।

যাকাত আদায়কালে গ্রহীতাকে এ কথা বলে যাকাত দেয়া জরুরি নয় যে, এটা যাকাতের মাল। বরং যাকাতের নির্দিষ্ট খাতে যাকাতের নিয়তে দান বা হেবা করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৪।

যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত হলো, প্রকৃত হকদারকে বিনিময়হীন ও শর্তহীনভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া। এভাবে হকদারকে বিনিময়হীনভাবে মালিক বানানো ব্যতীত যাকাত আদায় হবে না। সে মতে ইমাম মুয়াযযিনের বেতন ভাতা যেহেতু তাদের শ্রমের বিনিময় তাই এ খাতে যাকাত দিলে বিনিময়হীনভাবে মালিক বানানো হয় না। সুতরাং ইমাম মুয়াযযিনকে যাকাত প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে যদি মসজিদ কর্তৃপক্ষ বেতন ভাতা অন্য ফাণ্ড থেকে দেয় এবং দরিদ্র হওয়ার কারণে ইমাম মুয়াযযিনকে যাকাতের টাকাও প্রদান করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।–ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭০, বাদাইউসসানায়ে ২/১৪২।

যাকাতের টাকা দিয়ে কাফনের কাপড় ক্রয় করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া। আর মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।– রদ্দুল মুহতার ২/৩৪৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৮।

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া ও প্রধান মুফতী, মা'হাদুল
বুহুসিল ইসলামিয়া, ঢাকা।

তালিবুল ইলম মাহে রমাযান কীভাবে কাটাবে

মাওলানা নজরুল ইসলাম

তালিবানে ইলম : মাহে রমাযান

রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে পরিপূর্ণ মাস মাহে রমাযান। সকল মাসের মধ্যে এ মাস শ্রেষ্ঠতম ও মর্যাদাশীল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদিকে এই নেয়ামত দান করেছেন তাঁর প্রকৃত গোলাম হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য; গুনাহমুক্ত জীবনের প্রত্যয় নিয়ে তাকওয়ার সু-উচ্চ শিখরে পৌঁছার জন্য; সর্বোপরি সিয়াম-সাধনা আর মুজাহাদার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদত বন্দেগী করে চিরস্থায়ী জান্নাত হাসিলের জন্য।

একজন তালিবুল ইলম উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ রেখে বিনয়াবনত হন। তো একজন তালিবুল ইলম এই বরকতময় মাসকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন; কী ধরনের চিন্তা-চেতনা ও আমল নিয়ে এই মাস কাটাবেন; বক্ষমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা পেশ করা হবে।

প্রথমতঃ একজন তালিবুল ইলমের দায়িত্ব হবে, তিনি তার জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য একজন মুখলিস আল্লাহ ওয়ালাকে নিজের রাহবার হিসেবে গ্রহণ করবেন। জীবনের প্রতিটি বিষয় স্বীয় মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে আঞ্জাম দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ তালিবুল ইলমগণ নিজ তত্ত্বাবধায়ক ও মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে রমাযান মাসের জন্য একটি ইলমী-আমলী নেযামুল আওকাত অর্থাৎ নির্ঘন্ট প্রস্তুত করবেন এবং সে মোতাবেক চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন। নিম্নে কিছু জরুরী বিষয় তুলে ধরা হলো, যেগুলোকে তালিবুল ইলমগণ নিজ নিজ নেযামুল আওকাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিলে রমাযানের পরিপূর্ণ ফযীলত অর্জন করা ও তার হক আদায়ের ব্যাপারে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

১. কুরআনে মাজীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা

মাহে রমাযান কুরআন নাযিলের মাস। আল্লাহ তা'আলা রমাযান মাসের বরকতময় রজনী লাইলাতুল কদরে পূর্ণ কুরআনুল কারীম লওহে মাহফূয হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

অর্থ : রমাযান মাস, যে মাসে মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা স্পষ্ট হেদায়াত ও পার্থক্যকারী। (সূরা বাকারা- ১৮৫)

আল্লাহ পাক সূরায়ে কদরে ইরশাদ করেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন নাযিল করেছি বরকতময় রজনীতে। (সূরা কদ্‌র- ১)

যেহেতু রমাযানুল মুবারক কুরআন নাযিলের মাস সেহেতু একজন তালিবুল ইলমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে কুরআনে কারীমের সাথে গভীর সম্পর্ক কায়েম করা। কারণ কুরআন মাজীদই হলো একজন আলেম ও তালিবুল ইলমের আসল পুঁজি। কুরআনের সাথে সম্পর্ক যত মজবুত হবে ততই কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ হবে। কুরআনের সাথে শুধু দরসী সম্পর্ক একজন তালিবে ইলমের জন্য শোভনীয় নয়। কুরআনের সাথে তার সম্পর্ক যত গভীর হবে আল্লাহর দরবারে তার মান-মর্যাদা তত উন্নত হবে। আর এই সম্পর্ক কায়েম করার জন্য কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

(ক) বেশি বেশি কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা।

প্রত্যেক তালিবুল ইলমকে অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসে তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে হাফেযে কুরআন, যাদের সীনায় আল্লাহ পাক এই আমানতকে হেফাযত করেছেন তারা কোন ধরনের বিনিময় গ্রহণ ছাড়া তারাবীহ নামাযে খতম করবে। আর প্রস্তুতিকল্পে অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করবে ও পরস্পরে দাওর করবে। তারাবীহ নামায ছাড়াও নফল নামায যথা; কিয়ামুল লাইল, তাহাজ্জুদ ও আওয়াবীনে আরও ১/২ বার কুরআনে কারীম খতম করার চেষ্টা করবে।

আমাদের আকাবির-আসলাফদের অনেকের জীবনেই এই মা'মুলটি ছিল। জীবনীকারগণ বর্ণনা করেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. রমাযান মাসে ৬১ বার কুরআন খতম করেছেন। এক খতম দিনে, এক খতম রাতে আর এক খতম পূর্ণ রমাযানের সালাতুত তারাবীহতে। হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলেন, আমার শাইখ হযরত মাও. খলীল আহমাদ সাহারানপুরীকে একাধিক রমাযানে দেখেছি, স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও মাগরিবের ফরযের পর নফলের মধ্যে সূরা তিলাওয়াত করতেন অথবা শোনাতেন। তাই হাফেয তালিবুল ইলমদের জন্য তারাবীহ ছাড়াও অন্যান্য নাওয়াফেলে তিলাওয়াতের ইহতিমাম করা।

(খ) তাদাব্বুরের সাথে তিলাওয়াত করা।

যেসব তালিবুল ইলম তরজমাতুল কুরআন পড়েছেন তারা তিলাওয়াতের একটা অংশ তরজমা ও তাফসীরের প্রতি খেয়াল রেখে ধীরে ধীরে চিন্তা-ভাবনা করে তিলাওয়াত করবেন। এভাবে এক মাসের মেহনতে ইনশাআল্লাহ কুরআনে কারীমের অর্থ ও মর্মের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

(গ) তাসহীহে কুরআনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ।

অমনোযোগিতা ও গুরুত্বহীনতার কারণে যে তালিবে ইলমের মকতব-নাযেরায় কুরআনে কারীম বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন হয়নি রমাযান মাস তার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। তাকে নূরানী ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেহনত করে রমাযান মাসে কুরআনে কারীমের তাসহীহ করে নিতে হবে।

(ঘ) যেসব তালিবুল ইলম হাফেয নন তারা রমাযান মাসকে হিফযুল কুরআনের জন্য সুযোগ মনে করুন। দৈনিক কিছু কিছু অংশ মুখস্থ করতে থাকুন। প্রথমে ক্বারী সাহেবানগণ কুরআনে কারীমের যে সকল অংশ বেশি বেশি তিলাওয়াত করেন সেগুলো মুখস্থ করা যেতে পারে। যেমন, সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈলের ৯নং রুকু, সূরা কাহাফ ও সূরা হজ্জের শেষ রুকু, সূরা তাকভীর ও ইনফিতার ইত্যাদি। তারপর দৈনন্দিন আমলের সূরাগুলো মুখস্থ করবে। যেমন, সূরা ইয়াসীন, সূরা ওয়াকিয়া, সূরা মুলক, সূরা আলিফ-লাম-

মীম সাজদাহ, সূরা দাহর ও সূরা কাহাফ। তারপর তিওয়ালে মুফাস্সাল অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে নিয়ে বুরুজ পর্যন্ত সূরাসমূহের সহজতম সূরাগুলো মুখস্থ করবে। তবে কথা হলো, কারো জন্য হয়তো এক রমাযানে এর সবগুলো মুখস্থ করা সম্ভব হবে না। তবে মেহনত অব্যাহত রাখলে ৪/৫ রমাযানের বেশি লাগবেও না। তো শুধু রমাযানের মেহনতের ফলে যদি কুরআনে কারীমের এতটা অংশ হিফয হয়ে যায় তাহলে এটা খুবই সস্তা সওদা হবে।

(ঙ) কুরআনে কারীম শিক্ষা দেয়া।

নূরানী ট্রেনিং নেয়া তালিবুল ইলমগণ রমাযান মাসে চিল্লার জামাআতে/তারাবীহর মসজিদে/নিজ মহল্লায় নূরানী পদ্ধতিতে জনসাধারণকে কুরআনে কারীম শিক্ষার উদ্যোগ নিতে পারেন। দৈনিক এক ঘন্টা করে মেহনত করে যদি এক মাসে কাউকে কুরআনে কারীম শিখিয়ে দেয়া যায় তাহলে এটা আখেরাতের এক বিরাট পুঁজি হবে।

২. ইবাদতের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পাশাপাশি তালিবে ইলমকে রমাযানে নাওয়াফেলের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। রমাযান মাসে তালিবে ইলমের যেন তাহাজ্জুদ ছুটে না যায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এছাড়াও সকালে ইশরাক, চাশত, দুপুরে ফাইয়ে যাওয়াল, আসর ও ইশার পূর্বে চার রাকাআত এবং বাদ মাগরিব আওয়াবীনেরও পাবন্দী করা চাই।

৩. মাতা-পিতার খেদমত করা

তালিবুল ইলমগণ সারা বছর পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকার কারণে মাতা-পিতার সেবা করার তেমন একটা সুযোগ পান না। মাতা-পিতা খেদমতের মুহতাজ হলে তালিবে ইলমের উচিৎ রমাযান মাসে তাদের খেদমতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং এর মাধ্যমে ইলমের নূর হাসিল করা।

৪. দাওয়াত ও তাবলীগে সময় লাগানো

মাতা-পিতা খেদমতের মুহতাজ না হলে তাদের অনুমতি নিয়ে রমাযান মাসে দাওয়াত ও তাবলীগে সময় লাগানো যেতে পারে। এতে উম্মতের দীনী দুরাবস্থা সামনে আসবে এবং অন্তরে তাদের প্রতি রহম পয়দা হবে। সাথে সাথে নববী ফিকর ও যিম্মাদারির অনুভূতি সৃষ্টি হবে। তবে সাধারণ মানুষ ও একজন তালিবে ইলমের তাবলীগে সময় লাগানোর মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য থাকা চাই। এজন্য গতানুগতিকভাবে না হয়ে নেযামের সাথে সংস্কারসুলভ মনোভাব নিয়ে সময় লাগাতে হবে। বয়ান ইত্যাদির সুযোগ আসলে সেগুলো কুরআন-সুন্নাহর দলীল সমৃদ্ধ হতে হবে। দৈনিক ছয় নম্বরের প্রতি নম্বরের উপর কমপক্ষে দু'টি করে হাদীস অর্থ ও তাখরীজসহ মুখস্থ করা চাই। জামাআতের সাথীদের কমপক্ষে পাঁচটি করে সূরা শুদ্ধ করে দেয়া চাই এবং নামাযসহ দৈনন্দিন আমল ও কাজকর্মের সুন্নাত তরীকা হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়া চাই। খেয়াল করে করে মশওয়ারা, গাশত, তা'লীম, দাওয়াত, মুযাকারা ইত্যাদির নিয়ম ও আদব সংক্রান্ত দলীলগুলো বুঝে নেয়া চাই। এভাবে মেহনত করলে চিল্লায় কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হবে।

৫. আত্মশুদ্ধির ফিকির করা

আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তরের দশটি বদগুণের সংশোধন করা এবং দশটি সৎগুণ অর্জন করা ফরযে আইন। নবীর ওয়ারিশ তালিবুল ইলমের জন্য তা আরও জরুরী। আর আত্মশুদ্ধির জন্য রমাযান মাস অত্যন্ত উপযোগী। কাজেই তালিবুল ইলমগণ পরামর্শ সাপেক্ষে রমাযান মাসে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে হক্কানী পীর-মাশায়েখের খানকায় নির্দিষ্ট কিছু সময় ব্যয় করতে পারেন। এর মাধ্যমে যবানের ইলম সিনায় স্থানান্তরিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৬. বিভিন্ন তাদরীবে অংশগ্রহণ

রমাযান উপলক্ষে দেশের বড় বড় মাদরাসায় বিশেষজ্ঞ উস্তাদগণ নাহব, সরফ, আদব, অর্থনীতি, বাংলা সাহিত্য,তরবিয়াতুল মুদাররিস, নূরানী মু'আল্লিম ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের তাদরীবের ব্যবস্থা করে থাকেন। তালিবে ইলমগণ নিজ নিজ তা'লীমী মুরুব্বীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসব প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৭. ব্যক্তিগত অধ্যয়ন

তিলাওয়াত, তাসবীহাত, মাতা-পিতার খেদমত ও অন্যান্য জরুরী আমলের পাশাপাশি দৈনিক কিছু সময় ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। এর জন্য তা'লীমী মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করে কিতাব নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি সীরাত, তাফসীর, ইতিহাস ইত্যাদির একটি করে কিতাব; আলী মিয়া নদভী রহ. এর তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত, খুতবাতে আলী মিয়া, এ দু'টোর বাংলা অনুবাদ এবং নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী নির্বাচিত কিতাব অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

৮. পরবর্তী বছরের দরসী কিতাবের সঙ্গে পরিচিতি ও সম্পর্ক স্থাপন

প্রত্যেক তালিবুল ইলম পরবর্তী বছরের দরসী কিতাবসমূহের মূল দু' একটি কিতাবের সাথে রমাযান থেকেই মুনাসাবাত সৃষ্টির চেষ্টা করবে। জরুরী শরাহ-শুরুহাত সংগ্রহের ফিকির করবে এবং সেগুলোর সাথে কমপক্ষে পরিচিতিমূলক সম্পর্ক কায়েম করবে।

মিশকাত, দাওরা ও তাখাসসুসাতে ভর্তিচ্ছু তালিবে ইলমগণ কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের ঘোষিত ভর্তি পরীক্ষার কিতাবাদী মুতালাআ করবে।

সর্বোপরি আকাবিরীনে দীন কীভাবে রমাযান মাস কাটিয়েছেন কিতাবাদী থেকে তা পড়ে ও শোনে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবে।

শিক্ষা সচিব, দাওয়াতুল হক দেওনা মাদরাসা, গাজীপুর। খতীব, ইসলামপুর জামে মসজিদ, চকবাজার, ঢাকা।

(৪১ পৃষ্ঠার পর)

যে খেলায় লিপ্ত হয়ে শরীয়তের কোনও হুকুম পালনে উদাসীন হয়ে যায় তার জন্য খেলা বৈধ নয়।

(ক) উপরোক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী বর্তমানে বিভিন্ন দেশে দলীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সকল খেলা-ধুলা অনুষ্ঠিত হয় তার কোনটাই জায়েয হবে না। যদিও প্রশ্নে নামাযের পাবন্দ ও সতর ঢাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ফরয এতে অবহেলিত। সাথে বহু অবৈধ বিষয়ও এতে বিদ্যমান। এখন এই সকল খেলা পরিণত হয়েছে বেপর্দেগী, নাচ-গান, জুয়া, সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয় ও বিভিন্ন রকম গুনাহের উৎস হিসেবে। যা সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

(খ) উক্ত পুরস্কার যে খেলাকে কেন্দ্র করে, বর্তমান নিয়মে উক্ত খেলাই যখন নাজায়েয তখন তার উপর ভিত্তি করে পুরস্কার আদান-প্রদানও কারও জন্য বৈধ হবে না।

(গ) না, উক্ত টাকা তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা খেলোয়াড় বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। আর যদি তাকে শ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হয়, তবুও জায়েয হবে না। কারণ খেলা এমন কোনও শ্রম নয়, শরীয়ত মতে যার বিনিময়ে অর্থ বা পারিশ্রমিক দেয়া যায়। (সূরা লুকমান- ৬, সূরা মায়েদা- **৯১**, সূরা ইসরা- **২৭**, সূরা আ'রাফ- **৩১**, আন্নুতাফ ফিল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ৪৯২)

কিশোর প্রতিভা

বহুদিন পরে হলো মিলনমেলা

দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলছি। গন্তব্য জামি'আতুল আবরার। আজ সেখানে 'ফুযালা সম্মেলন'। পথের দু'পাশে সফেদ পোশাকের মিছিল। আন্তর পড়া স্মৃতিতে খুঁজে ফিরছে পুরোনো দিনগুলো। কে জানে কতদিন পর আজ সাথীদের সাথে মিলবে। পাঁচ বা দশ বছর কিংবা আরও বেশি বছর পর। তবে হ্যাঁ, সবাই রাহমানিয়ার সন্তান। তাদের নিয়ে গঠিত আমাদের 'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'।

পাকা সড়ক পেরিয়ে এখন আমরা বালুকালিপ্ত কাকড়ময় পথে। ঐতো জামি'আতুল আবরার। এখানে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়; অথচ বহুদূর। আশপাশটা এখনও অনাবাদ। হাউজিংয়ের খালি প্লটগুলোতে কাশবনের শুভ্রতা শোভা বৃদ্ধি করছে। কোনও কোনও প্লটে গজাচ্ছে অল্প বিস্তর গাছপালা। মাঝে আবার দু' একটা ইমারত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ভাঙ্গা ইটের দেউড়ির সামনে এসে পড়েছি। এটাই জামি'আতুল আবরারের মূল ফটক। ফটক পার হতেই দেখলাম চাদোয়াতলে ছোট ছোট ছেলেরা ফুযালাদের ব্যাজ লাগিয়ে দিচ্ছে। ঠাণ্ডা শরবত বাড়িয়ে ধরল এক বালক। চেহারায় খেশকুটুমের আন্তরিকতা। সূর্যের তজল্লায় কুঁকড়ে যাওয়ার পর শরবতে সজীবতা ফিরে এলো।

قسم المنصة وشؤون التزيين এর সদস্যদের দেখলাম অনুষ্ঠানস্থলে দৌড়ঝাঁপ করছে। অনুষ্ঠানকে অর্থবহ ও সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে তারা। পথে ইস্তিকবাল গ্রুপের আন্তরিকতা ভুলবার নয়। চা-পানি এবং খানা সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত অনেকের সাথে কথা হলো, প্রীত হলাম। অনুষ্ঠান ঘিরে জামি'আর নিবেদিত প্রাণ তালিবুল ইলমদের সদাপ্রস্তুত মনোবল চোখে পড়ার মত।সারাদিন স্মৃতির শবনমে সিক্ত হচ্ছিল ফুযালায়ে রাহমানিয়া। মাঝে সনভিত্তিক জমায়েতে স্মৃতির ঝুম বৃষ্টিও হয়েছিল।

সূর্য ক্লান্ত দেহে কিরণ ছড়াচ্ছে। বাতায়নের সূক্ষ্ম ছিদ্রে ফিল্টার হয়ে লেমন বর্ণের সূর্যালোক জুনি পোকার মত মৃদুমন্দ জ্বলছে। সন্ধ্যার পূর্বাভাসে সবাই ছুটে যাচ্ছে আপন গন্তব্য নীড়ে। এক বছর পর হয়তো আবার সাক্ষাত মিলবে। তাই সারাদিনের সুখ আনন্দ বিচ্ছেদ বেদনায় ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধারের মতোই আবছা হয়ে যাচ্ছে। চোখে বিষাদের পালতোলা নাও কালনী মেঘের ছায়ায় নিশ্চল হয়ে মৃদু মৃদু দুলছে...।

জামীল হাসান, লুধুয়া, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

'মা'

মা! নামটি অতি ছোট্ট। বড় আপন। কত মায়াময়, মধুময় এ ডাক। মা শব্দে লুকিয়ে আছে কত শত দুঃখ বেদনা, হাজার স্বপ্ন। মা ডাকে মিশে আছে আদর সোহাগ স্নেহ আর ভালবাসা।

আজ আমি মা হতে দূরে।বহু দূরে। আজ পাড়া গাঁ ছেড়ে ছুটে এসেছি ঢাকা শহরে। শুধু ইলমে ওহীর টানে। নায়েবে নবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে। ইলমের ওয়ারিস হতে।

আজ যখন উস্তাদের মুখে মায়ের কথা শুনি তখন আমার অন্তর কেঁদে ওঠে। মায়ের মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দুঃখিনী মায়ের করুণ চাহনি আমাকে আবেগাপ্লুত করে তোলে।

আজ আমার মায়ের কথা বেশ মনে পড়ে। মাকে দেয়া দুঃখ-বেদনা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। শত ব্যথা দেয়ার পরও গর্ভধারণ থেকে আজ অবধি মায়ের অবদান আমাকে ভাবিয়ে তোলে। কোনদিন কি পারবো মায়ের অবদানের বিনিময় দিতে? এক ফোঁটা দুধের বদলা দিতে? না! কোনদিন পারব না। আমি অক্ষম মায়ের অবদানের মূল্য দিতে। ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সব মমতার মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার শেখানো দু'আ-

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'আমার রব! আমার মা-বাবাকে আপনার রহমের চাদরে আবৃত করুন, যেমনি করে তারা ছোটকালে আমায় লালন-পালন করেছেন।'

মাসউদুল হক আবু তলহা, পাইকগাছা, খুলনা

পিতার ভালোবাসা

সকাল থেকেই আকাশটা বদরাগী ভাব ধরে আছে। এখন তো ফেটে পড়ার উপক্রম। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুত চমকাচ্ছে। দু' তিন দফা বিকট শব্দে বাজ পড়লো। আচমকা শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। এরই মধ্যে এক লোক পড়িমরি ছুটে এসে মাদরাসার করিডোর মাড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো।

আমার কৌতুহল হলো। সাথী ভাইদেরকে নাস্তা পরিবেশন করে মসজিদে এলাম। দেখলাম, লোকটি নামায পড়ছে। নামায শেষ করে লোকটি এক ছাত্র ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলো। আমি এগিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে ছাত্র ভাইটি বোর্ডিং থেকে এক প্লেট খিচুড়ি নিয়ে এলো। খাবার দেখে লোকটি কেঁদে ফেললো। আমি আর্শ্চয হলাম; সে ক্ষুধার্ত বলে তাকে খাবার দেয়া হয়েছে, এখানে কান্নার কী আছে! জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাই! কাঁদছেন কেন? উত্তরে সে যা বললো তাতে আমার চোখেও পানি চলে এলো। সে বললো, ভাই! আমার দু'টি ফুটফুটে নিস্পাপ সন্তান আছে। তারা ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করছে। কান্নাকাটি করছে। তাদের কষ্টে থাকতে না পেরে মুহাম্মদপুর ছুটে এসেছি। কিন্তু কোনো কাজ পেলাম না। রিকশা চালাতে চেয়েছিলাম। কেউ বিশ্বাস করে রিকশাও দেয় না। এখন খাবার দেখে সন্তানদের ছটফটানি মনে পড়ে গেলো। দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমার নিস্পাপ সন্তানদের ওপর রহম করেন। তার কষ্টের কথাগুলো শুনে বোডিংয়ের বেঁচে যাওয়া খিচুড়ি থেকে আরো কিছু খিচুড়ি এনে দিলাম। বললাম, আপনি বাসায় গিয়ে সন্তানদের নিয়ে খাবেন। খুশিতে লোকটির দু'চোখ ভিজে উঠলো। **(৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

রাবেতা সংবাদ

রাবেতার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

১০ মে শনিবার জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মিলনায়তনে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ দিন পর এ ছিল উস্তাদ-ছাত্রের এক অপূর্ব মিলনমেলা। তৃষ্ণার্ত হৃদয়গুলো অনেক দিন ধরেই এ দিনটির প্রহর গুণছিল।

এ বছর ফুযালাদের উপস্থিতি গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সম্মেলনে যোগ দিতে একদিন আগেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে তারা জামি'আয় উপস্থিত হতে থাকেন। সকাল ৯টায় কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে যথাক্রমে রাবেতার আমীরে শূরা আব্দুল কাইয়ুম আল-মাসউদ দা.বা., মুহতামিমে জামি'আ হযরত মুমিনপুরী হুযূর দা.বা., *রাবেতা* সম্পাদক মুফতী সাঈদ আহমদ দা.বা. গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। তারপর মুফতী সাহেব হুযূরের নসীহত ও দু'আর মাধ্যমে আসরের পূর্বে মাহফিল সমাপ্ত হয়।

রাহমানিয়ার হালচাল

খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ইউসুফ তাউলীর আগমন

১০ মে জামি'আ রাহমানিয়ার খতমে বুখারী অনুষ্ঠিত হয়। বুখারী শরীফের শেষ দরস প্রদান করেন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ও প্রবীণ মুফতী হযরত ইউসুফ তাউলী সাহেব দা.বা.। বয়ানে তিনি সমবেত উলামা ও তলাবাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেন। মাগরিবের পূর্বে হযরতের দু'আর মাধ্যমে মজলিসের সমাপ্তি হয়।

পাহাড়পুরী হুযূরের আগমন

একই দিন মাগরিবের পর সকলকে আনন্দিত করে হযরত পাহাড়পুরী হুযূর দা.বা. জামি'আয় তাশরীফ আনেন। তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কাছে মক্কা মুকাররমায় বুখারী শরীফের প্রথম ১৫ পারা ও মদীনা মুনাওয়ারায় দ্বিতীয় ১৫ পারা পড়ার স্মৃতিচারণ করেন।

রমাযানে উলামা-তলাবাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ইলমী কোর্স

আসন্ন রমাযানে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া কর্তৃপক্ষ সারাদেশের আগ্রহী উলামা ও তলাবাদের জন্য কয়েকটি ইলমী তাদরীবের ব্যবস্থা করেছেন। **তরবিয়াতুল মুদাররিসীন;** এতে অংশ নিয়ে একজন নবীন উস্তাদ পাঠদানের পদ্ধতি শিখতে পারবে। **তরবিয়াতুল মু'আল্লিমীন;** হারদুই তরযে তাসহীহে কুরআনে আগ্রহী হাফেয ও কারী সাহেবদের জন্য বিশেষ কোর্স। **নূরানী ট্রেনিং;** এটা নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের তত্ত্বাবধানে জামি'আর টিনশেডে অনুষ্ঠিত হবে। সকল প্রশিক্ষণ ১লা রমাযান হতে ২০ রমাযান পর্যন্ত চলবে।

মুদাররিসে জামি'আর স্পেন ও জার্মান সফরের প্রস্তুতি

জামি'আর প্রবীণ মুদাররিস হযরত মাওলানা আবু বকর সাহেব দা.বা. প্রায় পাঁচ মাসের দাওয়াতী সফরে স্পেন ও জার্মান যাচ্ছেন। গত বছর একজন মুহাদ্দিসের বিদেশ সফরের মধ্য দিয়ে এ ধারা চালু হয়েছে। হযরত সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তার সফরকে নিরাপদ করুন।